তন্ত্রের কথা

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

প্রকাশকের নিবেদন

সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালীর ধর্মজীবন-সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার বা ধর্মচর্চার অভাব ঘটিয়াছে—এ কথা মনে করার কারণ নাই। ধর্মীয় উৎসবাদিতে সমাবেশ ও উৎসাহের আধিক্যকে ঠিক হুজুগ বা বৈচিত্র্যসন্ধানী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ধর্ম-সম্পর্কিত পুস্তকাদি বাংলায় কিছু কিছু থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি বিশেষজ্ঞগণের জন্য রচিত; শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করেন নাই, এই শ্রেণীর সাধারণ পাঠকের উপযোগী নয়। এই অভাব মিটাইবার জন্য পূর্বে আমরা এই লেখকের লেখা 'উপনিষদের কথা' প্রকাশ করিয়াছি। উপনিষদ্ ভারতীয় ধর্মজীবনের আবহস্বরূপ; ঔপনিষদিক কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শিক্ষিত[1] বাঙালী জীবনে অপরিসীম। উপনিষদের ধারা ছাড়াও আর একটি ধারা বাঙালীর ধর্মজীবনের উপাদান, তাহা তন্ত্রের ধারা। অথচ, বিস্ময়ের কথা যে, তন্ত্র-সম্পর্কে সাধারণ বাঙালীর ধারণা আদৌ স্বচ্ছ নয়। হয় ইহাকে একটি অতি জটিল, প্রায়-অনাচরণীয় ধর্মপদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হয়, নয় অসামাজিক ও অশালীন পঞ্চ-'ম'-কার চর্চার মার্গরূপে জ্ঞান করা হয়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য এবং তন্ত্রশাস্ত্রের যে-সব বই পাওয়া যায় তাহাও সকলের বোধগম্য নয়। এই 'তন্ত্রের কথা' গ্রন্থে লেখক অতি সহজ কথায় তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনার বিভিন্ন ধারার আলোচনা করিয়া একটি সুসম্পূর্ণ রূপরেখা দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াস কতদূর সার্থক হইয়াছে, তাহা অবশ্য পাঠক-সাধারণ বিচার করিবেন।

সতীন্দ্রমোহনবাবু আমাদের অনুরোধে এই বিষয়ে লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আমাদের হাতে পাণ্ডুলিপি প্রদান করিয়া

বিদেশে যান। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানেই তাঁহার দেহান্তর ঘটে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য অশেষ যত্নে পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন এবং 'পূর্বাভাষ'-এ এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সতীন্দ্রমোহন-বাবুর কন্যা শ্রীযুক্তা রমা চক্রবর্তী দর্শনশাস্ত্রের গবেষক, তিনি এই বইয়ের 'বিষয়সূচী' রচনা করিয়া দিয়াছেন।

সাধারণ পাঠকের নিকট বইটি আদৃত হইবে ভরসা করি।

প্রকাশক

পূর্বাভাষ

'তন্ত্রের কথা'য় তন্ত্রের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা মোটের উপর স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা সহজেই লক্ষ্য করা যাইবে। তবে ইহা একটি রেখাচিত্র, পরিপূর্ণ চিত্র নয়; তন্ত্রশাস্ত্র এত বিশাল যে, 'তন্ত্রের কথা'র সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে তাহার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, বোধ হয় তাহার প্রয়োজনও নাই। কারণ তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য এই গ্রন্থ লেখা হয় নাই; তন্ত্রের সহিত প্রাথমিক পরিচয়-লাভে উৎসুক, প্রধানতঃ এই শ্রেণীর পাঠকের জন্যই 'তন্ত্রের কথা' লিখিত। এই উদ্দেশ্যে, শাস্ত্রের জটিল ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া, যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় তন্ত্রের মূল কথাগুলি সমস্তই ইহাতে বুঝাইয়া বলা হইয়াছে। কাজটি সহজ নয় কিন্তু গ্রন্থখানির বিষয়-বস্তুর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে যাহা যথার্থ জ্ঞাতব্য গ্রন্থকার তাহার কিছুই বর্জন করেন নাই, এবং যাহা গূঢ় বা রহস্য তাহার স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনেও চেষ্টার তিনি ত্রুটি করেন নাই।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রায় অসংখ্য বিষয়-বস্তুর মধ্যে এই গ্রন্থে যে-কয়টির সবিশেষ আলোচনা হইয়াছে তাহাদের মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: (১) তত্ত্ব-অংশ, (২) দেবার্চন-অংশ, এবং (৩) সাধনা-অংশ।

(১) তত্ত্ব-অংশে 'তন্ত্রে'র অর্থ, বেদ-এর সহিত ইহার সম্পর্ক, তন্ত্রশাস্ত্রের ইতিহাস ইত্যাদির সহিত রহিয়াছে তন্ত্র-বিহিত শক্তি-সাধনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ; এই শক্তি-সাধনাকেই বলা হইয়াছে তন্ত্রের সারতত্ত্ব। তবে স্বীকার করিতেই হইবে, তন্ত্রের তত্ত্ব-অংশ সাংখ্য বেদান্ত ইত্যাদির ন্যায় 'দর্শন' সংজ্ঞা লাভ করে নাই। কারণ ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্ব, পরিণামবাদ, ষট্‌চক্রভেদ ইত্যাদিতে পদার্থের বিচার থাকিলেও তন্ত্রে সাধন-প্রণালী ও ক্রিয়াকলাপেরই প্রাধান্য; দার্শনিক যুক্তি-বিচারকে উহাতে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, তন্ত্রশাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্তসমূহের মনোহারিত্ব অস্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে, উহাদের মৌলিকত্ব অবিসংবাদিত নয়। পণ্ডিতদের মতে, তন্ত্রের অনেক স্থলে সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়; যেমন, সাংখ্যের 'পুরুষ'ই তন্ত্রের 'শিব', 'প্রকৃতি' তন্ত্রের 'শক্তি'। শক্তি ও শিব পরস্পর অভিন্ন; শক্তিবিশিষ্ট

শিবই পরব্রহ্ম, শক্তি ব্যতীত শক্তিমান্ শিবের কার্যক্ষমতাই নাই—তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য-প্রণীত এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি স্মরণীয় :

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি, ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।
নো চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ॥

(২) দেবার্চন-অংশে স্থান পাইয়াছেন কালী দুর্গা প্রভৃতি বর্ণাঢ্য দেব-দেবী ও তাঁহাদের সুবিস্তৃত পূজা-পদ্ধতি ; দীক্ষা, অভিষেক, পুরশ্চরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক আচারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় এই পূজা-পদ্ধতির বর্ণনা সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইতিহাসের অনুসরণে আমরা দেখিতে পাই, অষ্টাদশ শতাব্দীর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও সাধক রামপ্রসাদের কাল হইতে অদ্যাবধি এই-সকল 'দক্ষিণাচার'এর বা প্রবৃত্তিমার্গের তান্ত্রিক পূজার প্রচলন ও সমাদর বাঙালী হিন্দুর সমাজে ক্রমেই বৃদ্ধিলাভ করিতেছে ; সেই অনুপাতে (বামাচার বা 'নিবৃত্তি'মার্গের) শব-সাধনা, ভৈরবী-চক্র ইত্যাদি অনুষ্ঠান অনাদর ও অবজ্ঞার বিষয় হইয়া ক্রমে প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়াছে। বাঙালী হিন্দুর আরাধ্য দেবতা কালী দুর্গা প্রভৃতির অর্চনা যেভাবে প্রসারলাভ করিতেছে, তাহা যথার্থ পূজার মানসিকতা, না অন্ধ তামসিকতা—কিসের প্রমাণ, এ তর্কের মধ্যে না গিয়া এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, মূর্তিপূজা সম্বন্ধে আজ হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর যে হীনমন্যতা ছিল এখন তাহা আর নাই। নাই, তাহার অন্যতম কারণ, আমাদের মতে, পরমহংসদেবের জীবন ও আদর্শ এবং এই সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন উক্তি ('ভক্তিরহস্য'-এ বিধৃত)।

(৩) সাধনা-অংশে স্থান পাইয়াছে কু-খ্যাত তান্ত্রিক আচার বা ক্রিয়া-কলাপের শাস্ত্রানুগ বর্ণনা ও গ্রন্থকারের স্বকীয় মন্তব্য। মনে রাখিতে হইবে, এই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ভৈরবীচক্র বা শব-সাধনায় সকলের অধিকার নাই। এই-সমস্ত আচার কেবল বামাচারী বা 'নিবৃত্তি'মার্গের সাধকের জন্য নির্দিষ্ট, বিশেষতঃ পঞ্চ-'ম'-কার-সাধনার অধিকার সর্বোচ্চ শ্রেণীর সাধকের অর্থাৎ 'দিব্যাচারী' বা 'কৌলধর্মী'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ, রাগদ্বেষ-বর্জিত মহাজ্ঞানী ও মহাযোগী না হইলে কাহারও এই সুকঠিন সাধনায় অধিকার নাই, ইহাই শাস্ত্রের সুস্পষ্ট বিধান। ইহা তান্ত্রিক সাধনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়

এবং এই সাধনার গূঢ় অর্থ বুঝিবার যোগ্যতাও সকলের নাই, বুঝাইবারও সহজ উপায় নাই। এই কারণে দেবাদিদেব শম্ভুর মুখ-নিঃসৃত এই বিদ্যা—'শাম্ভবী বিদ্যা'—অত্যন্ত গোপনীয় "ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব" (কুলার্ণব-তন্ত্র)। তন্ত্র-বিহিত এই যে সাধনা, যাহার সাহায্যে সাধক পরমহংসত্ব লাভ করেন, তাহা ক্রমে একদল অনধিকারী 'ভক্তে'র সংস্পর্শে কিভাবে বিকৃত হইয়া কুৎসিত রূপ ধারণ করিল, কিভাবেই বা তাহার বিলোপ ঘটিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পঞ্চম অধ্যায়ে রহিয়াছে। সুখের বিষয়, বামাচারী তান্ত্রিকগণ সমাজের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কিন্তু সমগ্র বাঙালী জাতির উপর তন্ত্রের 'দক্ষিণাচার'-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষায় বাঙালী 'ঘোর তান্ত্রিক'; বাঙালীর যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম, পূজা-অর্চনা কিভাবে তন্ত্রনির্ভর, বিশেষতঃ তাহার চিত্তবৃত্তিও কিভাবে তান্ত্রিক সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত, সপ্তম অধ্যায়ে তাহা গ্রন্থকার তাঁহার সাবলীল ভঙ্গীতে দেখাইয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

কিন্তু গ্রন্থ শেষ করিয়া গেলেও দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার উহা মুদ্রিত আকারে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। বিধাতার নির্মম বিধানে বিদেশে তাঁহার দেহাবসান হইল। সঙ্গত কারণেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সযত্নে লেখা তাঁহার এই গ্রন্থখানির সুষ্ঠু প্রকাশন হউক। সাহিত্য সংসদের কর্ণধার শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ঐ প্রতিষ্ঠানেরই কর্মসচিব শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ যথাসম্ভব অল্পকালের মধ্যেই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া পরলোকগত লেখকের প্রতি সার্থক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

তন্ত্রের অর্থ ও তন্ত্রশাস্ত্রের জন্মকথা

তন্ত্রের আভিধানিক অর্থ বহুবিধ। তার মধ্যে যে অর্থটিতে আমাদের প্রয়োজন, অর্থাৎ, যা তন্ত্রশাস্ত্রের তাৎপর্য বা মানে সাধারণজনের মনে স্পষ্ট করে তোলে, তাকে প্রকাশ করা চলে এভাবে : তন্ত্র হচ্ছে একজাতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ যা থেকে নানা দেবদেবীর পূজার জন্য, অথবা অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভের জন্য মানুষ একটা বিশিষ্ট পথের সন্ধান পেতে পারে। বাঙালী সমাজে 'তান্ত্রিক' বললেই মনে জেগে ওঠে শ্মশানচারী বীভৎস সন্ন্যাসীর চিত্র যার সঙ্গে জড়িত থাকে পঞ্চ'ম'কার সাধনা আর 'মারণ', 'উচ্চাটন', 'বশীকরণ', 'স্তম্ভন', 'বিদ্বেষণ' ও 'স্বস্ত্যয়ন' এই কৃষ্ণ বা দূষিত ষট্‌কর্ম। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ সমাজে যা ষট্‌কর্ম, বা শুক্ল ষট্‌কর্ম বলে খ্যাত, তা হচ্ছে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। তান্ত্রিক সাধনার প্রচলিত অর্থের সঙ্গে এ-সব চিত্র কেন জড়িত হল এবং এদের অর্থই বা কি, তা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখতে পাব।

তন্ত্রের অর্থ নিয়ে কিন্তু বাদানুবাদের সৃষ্টি কম হয়নি। সে বাদানুবাদ বহুযুগব্যাপী। এখানে মনে রাখতে হবে যে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই বেদ বা 'শ্রুতি'র সঙ্গে তন্ত্র সমান মর্যাদার অধিকারী হয়ে আছে। এই কথার প্রমাণস্বরূপ, মনুসংহিতার ব্যাখ্যায় কুল্লূকভট্ট যে প্রসিদ্ধ ঋষি-বাক্য উদ্ধৃত করেছেন তা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ কি, এই প্রশ্নের আলোচনায় কুল্লূকভট্ট হারীত-ঋষির এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন : "শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা—বৈদিকী তান্ত্রিকী চ" (২।১)। অর্থাৎ শ্রুতি (বা অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র) দ্বিবিধ : বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। কথাটাকে ঘুরিয়ে আরো

একটু স্পষ্ট করে বলা যাক। সকল শাস্ত্রই শ্রুতির ব্যাখ্যামাত্র। যুগে যুগে তার যে পরিবর্তন দেখা যায়, তা ঘটে শ্রুতির বিধানকে যুগোপযোগী করার জন্য; অন্য কোনো কারণে নয়। তান্ত্রিক আচার ও সাধনা শ্রুতিজাতই; তবে তান্ত্রিক ধর্মের বিশেষ প্রসার হয়েছে কলিযুগে মানুষের অক্ষমতা ও অপূর্ণতার কারণে। তন্ত্র কথাটি শিক্ষিত সমাজও অনেক সময়ে যথাযথ প্রয়োগ করেন না। সাধারণ জন তো বেদসম্মত পন্থা থেকে ভিন্ন যে-কোনো পন্থাকেই তান্ত্রিক বলে গ্রহণ করে। কিন্তু তান্ত্রিক পন্থা প্রকৃতপক্ষে শক্তিপূজা —সে শক্তির আধার পুরুষ নয়, নারী। তন্ত্রের উপজীব্য হচ্ছে পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত শক্তির পূজা। পুরুষ ও নারী, শিব ও শক্তি, একে অন্যের পরিপূরক। সাংখ্যদর্শনের সেই চিরন্তন পুরুষ ও প্রকৃতির কথা। প্রকৃতিই আদ্যাশক্তি; এই আদ্যাশক্তির সঙ্গে পুরুষের প্রকৃত সংযোগই তন্ত্রের মর্মবাণী।

কিন্তু এ-সব তত্ত্ব-বিচারে আমাদের প্রয়োজন নেই। একটি ভিন্ন অধ্যায়ে আমরা আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য তন্ত্রের মর্মবাণীর একটি চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছি। তন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ জনের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, শুধু তন্ত্র শব্দের অর্থ বলে সেই ধারণা বদলানোর চেষ্টা অর্থহীন। অবশ্য তা আমাদের লক্ষ্যও নয়।

এবার তন্ত্রশাস্ত্রের জন্মকথায় আসা যাক। বেদ ও তন্ত্রের জন্ম একই সময়ে অনুরূপ পরিবেশের মধ্যে। কুল্লূকভট্টের উদ্ধৃত ঋষি-বাক্যে বিস্ময়ের কারণ বা অসঙ্গতি কিছুই নেই। তান্ত্রিক পন্থা ও বৈদিক পন্থা দুটি যমজ ভাই-এর মত। বেদের মধ্যেই যে তান্ত্রিক ধর্মের কোনো কোনো কথা ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে তা কারোর চোখ এড়ানোর কথা নয়।

স্যর জন উড্রফ্ স্বনামে ও ছদ্মনামে (আর্থার এভালন) তন্ত্র-শাস্ত্রের সবিশেষ চর্চা করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

তিনি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করে, নিজে বাঙালী তান্ত্রিক গুরুর সাহায্যে তান্ত্রিক সাধনা করেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সব-ক'টি ধর্মশাস্ত্রেরই জন্ম হয়েছে বেদ থেকে, বেদেরই যুগোপযোগী নব নব ব্যাখ্যায়। কলিযুগের পক্ষে উপযোগী হয়েছে বেদের তান্ত্রিকী ব্যাখ্যা।

অনেকের মতে আদিম মানুষের নানাপ্রকার ভয়ের মধ্যে রয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রের জন্মবীজ। সর্পভয়, হিংস্র জন্তুর ভয়, রুদ্র প্রকৃতির ভয়, রোগভয় প্রভৃতি জানা ও অজানা শত্রুর আক্রমণের প্রতিষেধক-রূপেই তন্ত্রের প্রাথমিক মন্ত্রগুলির জন্ম হয়। সঙ্গে জুটেছিল অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভের চেষ্টা—এ-সব বিপদেরই প্রতিরোধকল্পে। তার ফলে এল জাদুবিদ্যা।

এ মতটির মধ্যে যে কিছু সত্য নিহিত রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এর প্রমাণ পাওয়া যায় অথর্ববেদে। সেখানে মন্ত্রশক্তি-সাধনা, তাবিজ, মাদুলি প্রভৃতি মন্ত্রৌষধের কথা, কৃষ্ণ ষট্‌কর্মের ইঙ্গিত রয়েছে ইতস্তত ছড়ানো। আদিম ভারতের নানাদেশেই ছিল এ-সব প্রতিষেধকের প্রতিপত্তি। স্বয়ং রাজা থেকে সাধারণ গৃহস্থ সবাই এ-সব মেনে চলতেন। অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ-প্রতিরোধে ব্যবহৃত হত মন্ত্র, সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বদলে। রোগশান্তিকল্পে করা হত স্বস্ত্যয়ন। অথর্ববেদে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকলে কোনো ব্রাহ্মণকেই রাজপুরোহিতের পদ দেওয়া হত না।

পূর্বে আমরা এই 'কৃষ্ণ' ষট্‌কর্মের নামোল্লেখ করেছি। এবার সহজ কথায় এদের অর্থ বলা যাচ্ছে।

ক. মারণ—কোনো বস্তুর ধ্বংস বা কোনো জীবের বধের উদ্দেশ্যে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

খ. উচ্চাটন—কোনো অবাঞ্ছিত জন যাতে উন্মূলিত হয় বা অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা বোধ করে, তার জন্য তান্ত্রিক বিধি।

গ. বশীকরণ—কোনো মানুষকে নিজের বশে আনার জন্য তান্ত্রিক ক্রিয়া।

ঘ. স্তম্ভন—ভূমিকম্প, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপদকে রোধ করার জন্য অথবা কাউকে শক্তিহীন করে ফেলার জন্য তান্ত্রিক নিয়ম।

ঙ. বিদ্বেষণ—যে-কোনো দু'জন মানুষের মধ্যে শত্রুভাব বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্য তান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

চ. স্বস্ত্যয়ন—কোনো মানুষের অথবা পরিবারের স্বস্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধি-কামনায় অথবা রোগশান্তি, গ্রহকোপ নিবারণ, বা বিপদ থেকে মুক্তির জন্য তান্ত্রিক পূজা।

এরই সাথে সাথে ব্রাহ্মণোচিত 'শুক্ল' ষট্‌কর্মের কথাও বলছি :

ক. যজন—পূজা বা যজ্ঞাদি কর্ম।

খ. যাজন—পৌরোহিত্য বা পুরোহিতের কাজ।

গ. অধ্যয়ন—মনোযোগ দিয়ে শাস্ত্রপাঠ।

ঘ. অধ্যাপনা—শিক্ষাদান (বিশেষ করে শাস্ত্র)।

ঙ. দান—কোনো মূল্যবান বস্তু যোগ্যপাত্রে দেওয়া।

চ. প্রতিগ্রহ—যথাযোগ্য দান গ্রহণ।

তন্ত্রে কৃষ্ণ ষট্‌কর্ম সাধনের যাবতীয় বিধি এবং স্থান, কাল ও পাত্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সে-সব বিধি না মানলে ফললাভ ঘটে না। বিধানগুলি নানা সূত্রে বদ্ধ। কর্মে সফলতার জন্য যথাযোগ্য দিনক্ষণের বিচার প্রয়োজন। এই বিচারের বিষয় বহুবিধ—কাল, অকাল, গ্রহের অবস্থান, ঋতু, বিভিন্ন কর্মে কোন্ দেবতার আশীর্বাদ প্রয়োজন প্রভৃতি। এ-সব বিচারে অভিজ্ঞ সাধকের বিধিই মান্য, আর তাঁরাই দেন এ-সব কর্মে মন্ত্রদীক্ষা। সে মন্ত্র ছাড়া সফলতালাভ অসম্ভব।

কথিত আছে, অথর্ববেদ একদা নয়টি শাখায় বিভক্ত ছিল।

এগুলির মধ্যে যেটিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা হচ্ছে 'পৈপ্পলাদসংহিতা'; কারণ এটি ছিল ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাখা অর্থাৎ এ অঞ্চলের লোক ছিল এ শাখারই অন্তর্ভুক্ত। এরা এই সংহিতার বা সঙ্কলনের নির্দেশকেই মেনে চলত। আর এই পূর্বাঞ্চলই ছিল তন্ত্রশাস্ত্রের পীঠস্থান। তান্ত্রিক মত, পূজা ও সাধনা বহুকাল ধরে ছিল এ অঞ্চলে প্রবল আর বহুকাল স্থায়ী। এখনো এই পূর্বাঞ্চলের সমস্ত পূজা ও নিয়ম নিষ্ঠা তন্ত্রভিত্তিক।

'পৈপ্পলাদসংহিতা'য় রয়েছে নানা বিষয়ের অপূর্ব সমাবেশ। একদিকে দেখা যাবে উদার, ভক্তিরসাত্মক দেবগীতি বন্দনা, সরস কাব্যধর্মী প্রার্থনা আর দার্শনিক প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা; আবার তারই সঙ্গে ওতপ্রোত রয়েছে রোগমুক্তির জন্য তাবিজ কবচের ব্যবস্থা, মারণ উচ্চাটনের কথা। আমরা এই দ্বিতীয় ফিরস্তার কিছু কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি।

ক. স মে অস্ত্ব ন্যক্ষক : সে যেন আমার চেয়ে হীনতর হয় অথবা সে যেন আমার অধীন হয়।

খ. পরীত্য বানিজমহের্বিষম্ : চারদিক ঘুরে গিয়ে আমি সাপের বিষ দূর করে দিচ্ছি।

গ. শাসাই শ্বশুরা উভৌ : শ্বশুর-শাশুড়ীর ওপর যেন আমার আধিপত্য জন্মে।

ঘ. মৃধি অভিঘাতীর্ব্যস্য : অনিষ্টকারী নিপাত যাক।

ঙ. উৎসক্তপত্নী ঔষধ আবতস্করণীদ অসি : স্ত্রীজাতীয় 'উৎসক্ত' গুল্ম বা লতা বশীকরণ বা মিলনের কাজে লাগে।

উদাহরণ-বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। আর প্রয়োজন নেই বেদের কাল নিয়ে বাদানুবাদ। কারণ, আমাদের যা প্রতিপাদ্য তা হচ্ছে এই যে, বেদের মধ্যে তান্ত্রিক আচার-আচরণের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে তন্ত্র মুক্তি-সাধনার একটা বিশিষ্ট পন্থারূপে কোন্ সময় থেকে গণ্য হয়েছে তা সঠিক জানা যায়নি।

এ সম্পর্কে একটা কথা আমাদের বার বার মনে হয়। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে শ্রেয় ও প্রেয়ের অর্থ ও সমস্যার কথা বুঝিয়েছেন। শ্রেয়ঃ কি? শ্রেয় চরম শান্তি, সর্বকামনা ও সর্ববন্ধন থেকে মুক্তি। প্রেয়ঃ কি? প্রেয় মানুষের ইহলোকের সব প্রিয় বস্তু যা তাকে সর্বসুখ দেবে বলে সে আশা করে। শ্রেয় ও প্রেয় একত্র বাস করে, একসাথে এসে মানুষের কাছে উপস্থিত হয়। সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে প্রেয়কে, দু-একজন অসাধারণ মানুষ বরণ করেন শ্রেয়কে। সাধারণ মানুষ চায় 'ধনং দেহি, রূপং দেহি, জয়ং দেহি, দ্বিষো জহি।' অর্থাৎ আমাকে ধন দাও, রূপ দাও, জয় দাও আর আমার শত্রু বিনাশ কর। তন্ত্রের জন্মবীজ রয়েছে এই প্রেয় কামনার মধ্যে আর তার পরিণতি ঘটেছে তান্ত্রিক সাধনায়। প্রবৃত্তির পথ ধরে ক্রমে নিবৃত্তির পথে প্রবেশ করাই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। তন্ত্রশাস্ত্র তাই প্রেয় কামনার মধ্য দিয়ে শ্রেয়ঃ বা অমৃতত্ব লাভের পথ-নির্দেশক। শ্রেয়োলাভের পন্থা প্রেয়কে বর্জন করে চলে অমৃতত্বের পথে, আর তন্ত্রপন্থা প্রেয়ের পাশকে প্রথমে গ্রহণ, পরে বর্জন ও অতিক্রম করে সেই একই পথে—শ্রেয়োলাভের পথে উপনীত হয়।

তন্ত্র তাই সাধারণ মানুষের কামনা-বাসনাকে অস্বীকার করেনি, তাকে এড়িয়ে যেতে চায়নি। জীবনের প্রতি তন্ত্রের এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্বীকার করার উপায় নেই, আর স্বাগত না করে পারা যায় না এই বিপুল কণ্টকবহুল বনের মধ্য দিয়ে মুক্তির একটা পথের নির্দেশকে। শ্রেয়ের মর্মবাণীর যে সন্ধান পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, তার চেয়েও জীবনের বাস্তব, গভীর ও বর্ণবহুল বিশ্লেষণ পাওয়া যায় তন্ত্রে। এই জন্যই হয়তো শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন :

"গীতায় মানবজীবনের যে পথ-নির্দেশ রয়েছে, যে অপূর্ব বিশ্লেষণ তার মর্মবাণী, তার চেয়েও নির্ভীক ও সবল বিশ্লেষণ দেখা যাবে তন্ত্রে, যদিও এটি গীতার বিশ্লেষণের মত অত সূক্ষ্ম ও অধ্যাত্ম-ভিত্তিক নয়। কারণ, তন্ত্রে যে পথ-নির্দেশ ও বিশ্লেষণ রয়েছে তার

মূল কথা এই যে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের যা-কিছু প্রতিবন্ধক সে-সবকেই জোর করে তার অনুকূল করে তুলে একটা পরম আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ করতে হবে যাতে আমাদের বাস্তব-সম্মিত সামগ্রিক জীবনের প্রতি স্তরে ভগবানের লীলা অনুভব করতে পারা যায়। কোনো কোনো দিক থেকে বিচার করলে তন্ত্র-পন্থাকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও ফলপ্রসূ বলে মনে হয়। তন্ত্র-পন্থায় দিব্যজ্ঞানের সঙ্গে পুরোভাগে এসেছে দিব্য কর্মকাণ্ড আর ঐশ্বর্যময় দিব্যপ্রেম। হঠ ও রাজযোগের মর্মকথা এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ; দেহ ও মনের বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সুষম ব্যবহারে দিব্যজীবনের সকল স্তরই বিকশিত হয়েছে। গীতায়ও এ-সবের ইঙ্গিত রয়েছে সত্য, তবে তা প্রাসঙ্গিক ও ভাসা-ভাসা। তারপর তন্ত্র-পন্থায় রয়েছে পরিপূর্ণ দিব্যজীবন-লাভের বাস্তব স্বপ্ন যা ছিল বেদের ঋষিদের। সে স্বপ্ন বেদের পরবর্তী যুগেই মানুষের মন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে কিন্তু ভবিষ্যতে তাকেই পরম সম্বল করে মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা বিশ্লেষণ ঘটবে।"—Introduction : Essays on the Gita.

এমন যে তন্ত্রশাস্ত্র তার প্রথম আবির্ভাব কোথায় হয়েছিল, তা নিয়ে বহু বাদানুবাদ রয়েছে। কারো কারো মতে ভারতবর্ষেই এর জন্ম হয়েছে বটে, তবে আর্যেতর বংশে। সেখান থেকে এনে, একাধিক অর্থে তাকে সংস্কৃত করে, আর্যেরা তাকে জাতে তুলে তান্ত্রিক দর্শন গড়ে তুলেছে। অন্ত্যজদের মণ্ডপেই যে হিন্দুদের দুর্গা, কালী প্রভৃতি পৌরাণিকী দেবীপূজার বোধন হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে দু-একটি ছাড়া, 'দেবী'র অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেও চলে, অথচ 'দেবী'র সঙ্গে মাতৃকেন্দ্রিক দ্রাবিড় সমাজের একটা মূলগত সম্পর্ক অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তাই কারো কারো মতে 'দেবী'-ভিত্তিক তন্ত্র বা শক্তি-সাধনার জন্ম

হয়েছে দ্রাবিড় জাতির ঘরে। 'কাদম্বরী'তে খ্যাতনামা কবি বাণভট্ট চণ্ডিকাদেবীকে শবরেরা পশুমাংস ও রক্তের উপচারে পূজা করছে বলে বর্ণনা করেছেন। চণ্ডিকাদেবীর পূজক একজন দ্রাবিড় পুরোহিত।

বৈদিক ধর্মের গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে শক্তি-সাধনার কোনো মিল নেই বলে (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ) কারো কারো মতে তন্ত্র-সাধনার জন্ম এ দেশে ঘটেনি—ঘটেছে ভারতবর্ষের বাইরে। এ সাধনা-পদ্ধতি এ দেশে এসেছে উত্তর-পশ্চিম দুয়ার দিয়ে হয়ত 'মগী' (Magi/Magus) পুরোহিতদের কাঁধে ভর করে। 'মগী'রা আদিম পারশীক পুরোহিতদের বংশ। কথিত আছে এরাই শিশু-যিশুখ্রীষ্টের জন্য নানা উপহার নিয়ে গিয়ে জেরুজেলামে তাঁকে স্বাগত করে এসেছিলেন।

শক্তি-সাধনা এ দেশে এসে কিন্তু বৈদিক জগতে স্থান করে নিতে পারেনি। ঠাঁই পেয়েছে দেশের পূর্বাঞ্চলে যেখানে বৈদিক ধর্ম ছিল শিথিলতম। বিশেষ করে এই আঞ্চলিক আবাসের কথা স্মরণ করেই হয়ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত উইন্টারনিজ (Winternitz) বলেছেন, তন্ত্রের জন্মভূমি বাঙলা ; সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়েছে আসামে। তারপর বৌদ্ধতন্ত্রের কাঁধে ভর করে তা ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছেছে নেপালে, তিব্বতে ও চীনে।

কথাটার মধ্যে হয়ত কিছু সত্য নিহিত রয়েছে। তন্ত্রের জন্ম ও লীলাভূমি সম্পর্কে একটি পুরনো শ্লোক প্রচলিত আছে। কিন্তু এটির রচনাকাল ও রচক দুই-ই অজ্ঞাত। শ্লোকটি এই :

"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা, মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা॥"

অর্থাৎ তন্ত্রবিদ্যার জন্ম হয়েছে গৌড়ে, তার প্লাবন ঘটেছে মিথিলায়, মহারাষ্ট্রে এর প্রভাব কিছু কিছু দেখা গেছে, আর এ বিদ্যা লয় পেয়েছে গুজরাটে।

তন্ত্রশাস্ত্রের রূপ দ্বিবিধ : বৌদ্ধ ও হিন্দু। এই দুই সম্প্রদায়ের তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থের মধ্যে যে মূলগত বিশেষ ইতরবিশেষ রয়েছে তা নয়, তাদের প্রভেদটা মোটামুটি রূপগত, লাক্ষণিক। সে প্রভেদের কথায় পরে আসা যাচ্ছে। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের সমবেত সংখ্যা অগণিত; অসংখ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'মহানির্বাণ' তন্ত্রের ভূমিকায় তিনশ্রেণীর তন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় : বিষ্ণুক্রান্তা, অশ্বক্রান্তা ও রথক্রান্তা। অসংখ্য তন্ত্ররাজির মধ্যে মাত্র এক শ-বিরানব্বুইখানাকে বেছে নিয়ে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এই বিভাগের মূলকথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর তন্ত্রের উপযোগিতা স্বীকার। তাই, বিভিন্ন অঞ্চলগুলিকেও তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্র যে হিন্দুতন্ত্রশাস্ত্রের অগ্রজ তাতে সন্দেহ নেই। এ মন্তব্যের কারণ পরে বলছি। বৌদ্ধতন্ত্রের জন্মকালের একটা মোটামুটি ইতিহাস এখানে বলা যাক।

অথর্ববেদের কালে, অথবা তারো পূর্ব থেকেই যে সমাজে কবচ, তাবিজ, মন্ত্র প্রভৃতির বহুল প্রচলন ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। নানা কুসংস্কার ছাড়াও, মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে কেউ বেছে নিয়েছিল শরীর-পীড়ন, কেউ সংস্কার-ভিত্তিক আচারের পথ, কেউ মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সংযোগের চেষ্টা, কেউ বা বামদেবের পূজার ছলে বীভৎস কামলীলার মত্ততা। এই বামদেবের পূজার কথা যথাসময়ে বলা যাবে। মন্ত্র ও ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির তো লেখাজোখাই ছিল না।

সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা বুদ্ধদেবের দৃষ্টি এড়ায় নি। বুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মানুষ। এ অবস্থাটা যে শুধু তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি তা নয়, কারো কারো মতে এ-সব যে তাঁর ধর্মের মধ্যে স্থান পেয়ে যাচ্ছে, ক্রমে ক্রমে জন-সমাজে এই-সব অবাঞ্ছিত ক্রিয়া-কলাপের অনুপ্রবেশ ঘটছে, তাঁর তা অজানা ছিল না। অথচ,

তিনি তাঁর ধর্মকে পুরোপুরি জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, ক্রমে ক্রমে জনসাধারণ মহত্তর জীবনের আস্বাদ পেলে এ-সব হীনজন-সুলভ ক্রিয়াকলাপ লোপ পাবে। এ সম্পর্কে আমরা অষ্টম শতকের বৌদ্ধপ্রধান শান্তরক্ষিতের কথা স্মরণ করছি। তাঁর মতে বুদ্ধদেবের জ্ঞাতসারেই এই-সব ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধসমাজে স্থান পেয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবিতকালেই বৌদ্ধেরা তন্ত্র-মন্ত্রের চর্চা করত।

'বিনয়-পিটক'-এর কোনো কোনো গল্পে এ-সকলের স্পষ্ট আভাস রয়েছে। হয়ত বুদ্ধদেবের নিজের শিষ্যদের মধ্যে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও জাদুবিদ্যার প্রচলন ছিল।

পালিভাষায় লেখা বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথার মধ্যে এমন কিছু কিছু চিহ্ন রয়েছে যা তান্ত্রিক আচার ও চিন্তাধারারই শামিল। অবশ্য 'তন্ত্র' কথাটা উচ্চারিত হয়নি। কারো কারো মতে 'পঞ্চকাম-গুণাদিট্‌ঠধম্ম-নিব্বাণবাদ' কথাটা বুদ্ধদেবেরই মুখনিঃসৃত বাণী। এর অর্থ ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ সম্ভোগের মধ্য দিয়েই নির্বাণ লাভ করা। তবে বুদ্ধদেবের স্বমুখনির্গত বাণীরও পরবর্তীকালে কদর্থ হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু একশ্রেণীর শ্রমণ যে যুবতী শ্রমণার সঙ্গকে 'ধম্ম' বলে মনে করত তাতে সন্দেহ নেই। আর এ কথাটায়ও সন্দেহ নেই যে সেকালে কিছু কিছু শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে মত্ত হয়ে, জাদুকরি সম্বল করে জীবিকানির্বাহ করত। সে-সব জাদুকরির মধ্যে থাকত মানুষের আয়ুষ্কর ও দেহের অবক্ষয়রোধের মন্ত্র, বিত্তলাভের জন্য স্বস্ত্যয়ন বা কবচদান, বন্ধ্যা নারীর জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি 'কৃষ্ণ' ষট্‌কর্ম। কোনো কোনো শ্রমণ নরকপালও ব্যবহার করত।

ঠিক কোন্ কাল থেকে যে তন্ত্রসাধনা একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়েছিল তা বলা যায় না, তবে বুদ্ধের আমলের পূর্ব থেকেই

তথাকথিত তান্ত্রিক আচার-আচরণের বহুল প্রচলন ঘটেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এখন পর্যন্ত যে-সব তন্ত্রশাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে যে সব-ক'টিই খুব পুরনো তা নয়। বরং বেশির ভাগ তন্ত্রশাস্ত্র নিতান্তই আধুনিক বলা চলে। বিদ্বজ্জনের মতে সর্বাপেক্ষা পুরনো তন্ত্র লেখা হয়েছে খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় দু হাজার বছর পূর্বে। তারপর সে শাস্ত্ররচনা চলেছে অব্যাহত গতিতে অষ্টাদশ এমনকি ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত। কতগুলি তন্ত্রের কালের মোটামুটি হদিস পাওয়া গেছে, যেমন 'সর্বজ্ঞানোত্তর তন্ত্র' ও 'কুব্জিকাতন্ত্র'। এ দুটি লেখা হয়েছে গুপ্ত যুগে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বৌদ্ধ-তন্ত্র হিন্দু-তন্ত্রের চেয়ে পুরনো। এ দলের অনেকগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে লেখা। এই প্রসঙ্গে 'হেবজ্রতন্ত্র', 'কালচক্রতন্ত্র', 'বুদ্ধকপালতন্ত্র' প্রভৃতি কয়েকখানি প্রথম যুগের বৌদ্ধ-তন্ত্রগ্রন্থের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। এদের বিষয়বস্তুর উৎস বৌদ্ধ 'ধারণী'গুলি, পণ্ডিতেরা এ অনুমান করেন। তাঁদের মতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের বৌদ্ধ মনীষী অসঙ্গ এই শ্রেণীর গ্রন্থ-সঙ্কলনে প্রেরণা দেন ও বৌদ্ধদের মধ্যে তন্ত্রের প্রচলন আরম্ভ করেন। বৌদ্ধধর্মের কঠোর আচারনিষ্ঠার মাহাত্ম্য সকল শ্রেণীর বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর কাছে সমাদরের বস্তু ছিল না। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা তরুণ ও তরুণী, তারা এ-সব বিধি-নিষেধ পরম অবাঞ্ছিত বলেই মনে করত। এই মনোভাবের ফলে তথা-কথিত তান্ত্রিক আচার-আচরণের মধ্যে তারা পেল মুক্তির সন্ধান। কিন্তু সে-সকল সহজ মুক্তির বার্তা তো আর প্রকাশ্যে বলা চলে না! প্রকাশ্যে বললে বিহার থেকে বহিষ্করণ অনিবার্য। কাজেই কিশোর-কিশোরী ছাত্রের কাব্যচর্চার মতই তার চর্চা চলল গোপনে। এগুলিকে ঠিক তন্ত্র আখ্যা দেওয়া চলে না; বলা যায়, এরা তন্ত্রশাস্ত্রের অগ্রদূত হয়ে দেখা দিল। বৌদ্ধতন্ত্রে

এদের বলা হয় ধারণী বা সংগীতি। অর্থাৎ বৌদ্ধতন্ত্রের প্রথম রূপ-সংগীতি।

তৃতীয় বা চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'গুহ্যসমাজ'ই এখন প্রথম বিধিবদ্ধ বৌদ্ধতন্ত্র রচনা বলে গণ্য।

তন্ত্রশাস্ত্রের ঘনারণ্যে প্রবেশ-লাভের সন্ধানে আমরা এ পর্যন্ত কি কি পেলাম ?

তন্ত্রের আভিধানিক অর্থ কি? তন্ত্রশাস্ত্র বলতে আমরা কি বুঝি? শ্রীঅরবিন্দ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যর জন উড্রফ্ প্রমুখ মনীষিগণ তন্ত্রশাস্ত্রের কি ব্যাখ্যা করেছেন ?

তারপর জেনেছি তন্ত্রশাস্ত্রের জন্মকাহিনী। তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদের প্রায় সমসাময়িক তারও প্রমাণ পেয়েছি। উপনিষদে রয়েছে 'শ্রেয়ের' প্রশস্তি আর তন্ত্রে রয়েছে 'প্রেয়ের' সংগীতি। প্রেয়কে বাদ দিয়ে মানব-জীবনের অর্থ খোঁজা অবাস্তব। বাস্তব জীবনে তন্ত্র-শাস্ত্রের, তার মর্মবাণীর যথেষ্ট সার্থকতা রয়েছে; একে মূল্যহীন, অপকৃষ্ট যাঁরা বলেন তাঁরা কল্পনা-বিলাসী। বস্তুতঃ প্রেয়ের মধ্য দিয়ে শ্রেয়োলাভই সাধারণ মানুষের কাছে জীবনের উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধ তন্ত্র হিন্দু-তন্ত্রের অগ্রজ। বুদ্ধের জীবিতকালেই বৌদ্ধ-তন্ত্রের সূচনা হয়েছে; বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রথম রূপ 'সংগীতি'। 'গুহ্যসমাজ' বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রথম বিধিবদ্ধ রচনা।

তন্ত্রশাস্ত্রের খান-কয়েক পুঁথি মাত্র পুরনো; সবচেয়ে পুরনো পুঁথির জন্ম হয়েছে খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে। অর্থাৎ সেখানি যিশুখ্রীষ্টের সমসাময়িক। বলা বাহুল্য পুরনো পুঁথিগুলি বৌদ্ধ-তন্ত্রের।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তন্ত্রশাস্ত্রের আশ্রয়

বেদ-বিহিত মত ও পথের সীমানা থেকে সরে গিয়ে তন্ত্র প্রথম আশ্রয় পেল বৌদ্ধবিহারে সংগীতিরূপে। তখন তার অবস্থা শৈশবের; অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট সাধনার পথ হিসাবে গণ্য হতে তখনও তার অনেক দেরী। সেই মর্যাদা সে লাভ করল বেশ কয়েক শ' বছর পরে।

ভগবান্ বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে বৌদ্ধধর্ম ঝড়ের মুখে একটা নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত ঘুরপাক খাবে তা পূর্বে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবু তা ঘটল। ভগবান্ বুদ্ধের অত্যুচ্চ আদর্শ ও অনুগামীদের পালনীয় অতি-কঠোর বিধান একশ্রেণীর ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর কাছে কারাপ্রাচীরের মত বোধ হতে লাগল। তারা বুদ্ধের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হল। সেই আদর্শচ্যুতির একটা সহজ পথ আবিষ্কার করার জন্য মন ছিল তাদের উন্মুখ। সে পথের সন্ধানও বিদ্রোহীর দল অচিরেই পেল।

বুদ্ধদেব নিজে কিছু লিখে যাননি। কিন্তু তাঁর মুখনিঃসৃত দুটি কথা নিয়ে যে বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হল তার তুলনা নেই। কথা-দুটির একটি 'নির্বাণ', অন্যটি 'করুণা'।

নির্বাণ বলতে ঠিক কি বোঝায় তা বুদ্ধদেব কখনো স্পষ্ট করে বলেন নি, এটা ছিল তাঁর বহু শিষ্যেরই অভিমত। তিনি এ সম্পর্কে যা বলতেন তা হল, নির্বাণ লাভ করলেই বুঝতে পারবে নির্বাণ কি। হয়ত বোঝাতে চাইতেন নির্বাণ-তত্ত্ব কেবল অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। প্রথম শতকের মানুষ অশ্বঘোষ প্রদীপের সাথে তুলনা করে নির্বাণ-তত্ত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, তেলের অভাবে প্রদীপটি যেমন

আস্তে আস্তে নিভে যায়, মানুষও তেমনি আকাঙ্ক্ষাজাত দুঃখক্লেশের অভাবে ক্রমে বিলয় পায় অর্থাৎ সাধকের মন সম্পূর্ণরূপে আকাঙ্ক্ষা-হীন হলেই তাঁর নির্বাণলাভ ঘটে।

প্রধানত 'নির্বাণ' কথাটির ব্যাখ্যা নিয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়ে গেল। অশ্বঘোষের ব্যাখ্যা গ্রহণ করল 'হীনযানে'র দল। এঁরা গোঁড়া, নৈষ্ঠিক, বুদ্ধদেবের শুদ্ধসত্ত্বের আদর্শে বিশ্বাসী। কাজেই এদের দল ভারী হল না। দল ভারী হল 'মহাযানী'দের ; তাঁরা অশ্বঘোষের ব্যাখ্যাকে আমল দিল না। হীনযান ও মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের মধ্যে বেধে উঠল তীব্র বিরোধ।

মহাযানপন্থীদের নেতা স্বনামখ্যাত ভিক্ষু নাগার্জুন দ্বিতীয় শতকের মানুষ। তিনি নির্বাণের ব্যাখ্যা করলেন ছয়টি নঞর্থক বা অনস্তিত্ববাচক বিশেষণ দিয়ে। সে ব্যাখ্যার বিচারে আমাদের প্রয়োজন নেই কিন্তু তা যে সাধারণ মহাযানপন্থীদের বোধগম্য ও মনঃপূত হতে পারে না ও হল না তা বলাই বাহুল্য। নাগার্জুনের পরবর্তী যোগাচার্যেরা এই ব্যাখ্যাকে নূতন রূপ দিলেন সদর্থক বা অস্তিত্ববাচক বিশেষণ দিয়ে। একে বলা হল 'বিজ্ঞানবাদ'। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও সাধারণ বৌদ্ধ-সমাজের পছন্দসই হল না।

বিজ্ঞানবাদের স্থান ক্রমে দখল করল 'মহাসুখবাদ' যার অন্য নাম 'বজ্রযান। এই বজ্র যে তিনটি তত্ত্বের সংমিশ্রণে তৈরী তা হল শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্য ও বিজ্ঞানতত্ত্ব-বিচারে আমাদের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন রয়েছে মহাসুখের ব্যাখ্যায়।

হীনযানপন্থীদের মনে তন্ত্র স্থান পায়নি, স্থান পেয়েছিল মহাযানপন্থীদের কাছে। বলা বাহুল্য, বজ্রযানের মধ্য দিয়েই তন্ত্রের আদর্শ ও তান্ত্রিক সাধনা বৌদ্ধসমাজে স্থান পেল। এই বজ্রযানই হল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, যাকে বৌদ্ধধর্মের অপচ্ছায়া বা অপভ্রংশ ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না।

এখন 'মহাসুখবাদের' কথা বলা যাক। বোধি অর্থ পরম জ্ঞান।

বৌদ্ধ তান্ত্রিকের মতে এই পরম জ্ঞানের স্পর্শেই মন বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ লাভ করে। নির্বাণলাভে যে পরমানন্দের আস্বাদ পাওয়া যায় তার সঙ্গে তুলনীয় শুধু স্ত্রী-পুরুষের আলিঙ্গনাবদ্ধ সুখের অনুভূতি।

তাদের মতে যারা মুমুক্ষু বা নির্বাণপ্রার্থী তাদের সততই 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র সঙ্গলাভ বিধেয়। প্রজ্ঞাপারমিতার অর্থ অমিশ্র বা খাঁটী সত্য যা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। এই যে 'প্রজ্ঞা' বা তত্ত্বজ্ঞান তা রয়েছে সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই, কাজেই সকল স্ত্রীলোকই সমভাবে গ্রহণীয় ; কেহই বর্জনীয় নয়। এতে ধনী-দরিদ্রের বিচার নেই, উঁচু-নীচু জাতের প্রভেদ নেই—আর নেই প্রভেদ শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতার। এমনকি এ ব্যাপারে সামাজিক বন্ধনের কথা তোলাও নিরর্থক। সেকালের তান্ত্রিকদের মুখে মুখে যে শ্লোকটি সদাসর্বদা শোনা যেত তা হল :

"কর্মণা যেন বৈ সত্ত্বাঃ কল্পকোটিশতান্যপি
পচ্যন্তে নরকে ঘোরে তেন যোগী বিমুচ্যতে।"

অর্থাৎ যে-সকল কর্মের ফলে সাধারণ মানুষ শতকোটি কল্প নরকে পচে মরে, যোগীরা সে-সকল কর্মের সহায়তায়ই মুক্তিলাভ করে।

এ সম্পর্কে আরো যে-সব কথা রয়েছে তা যথাস্থানে বলা যাবে।

এ-হেন বজ্রযান যে সাধারণ জনের পরম আদরের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে তাতে আর সন্দেহ কি ? তা-ই হল বটে আর নিরয়গামী তন্ত্রের পরম আশ্রয় হয়ে রইল বজ্রযান।

আমরা এ পর্যন্ত নির্বাণ শব্দের অর্থ নিয়ে দ্বন্দ্বের কথা বলেছি, কিন্তু 'করুণা'র কথা বলিনি। এ শব্দটি যে অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। শুধু এর অর্থভেদ নিয়ে হীনযান ও মহাযানপন্থীদের মধ্যে প্রভেদ যে আরো বেড়ে গেল তা-ই আমাদের বক্তব্য।

সকলকেই একক, কেবল নিজ নিজ তপস্যার বলে নির্বাণ লাভ

করতে হবে—এই হল হীনযানীদের মত। আর এই মতে তারা রইল অটল। কিন্তু পরম কারুণিক মহাযানীদের মতে নিজের নির্বাণত্ব-লাভের চেয়ে অন্যের নির্বাণত্বলাভে সাহায্য করা অধিকতর শ্রেয় এবং মহত্তর কর্ম। এই প্রচেষ্টায় যদি বার বার জন্মমৃত্যু-চক্রকে বরণ করতে হয় তাতেও ক্ষতি নেই। অপরের প্রতি করুণার এই যে ব্যাখ্যা, এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভিক্ষুদের দৃষ্টি পড়ল অবলা ভিক্ষুণীদের ওপর, আর অনেক ক্ষেত্রে গুরুরা শিষ্যাদের মহাসুখদানে তৎপর হয়ে উঠলেন। এইভাবে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যায় সমাজের নীতিবোধ ক্ষুণ্ণ হতে লাগল; তন্ত্রের অপযশ মানুষের মনে অটল হয়ে গেঁথে রইল।

বজ্রযান বৌদ্ধ-তন্ত্রের শেষ আশ্রয়। এই শেষ আশ্রয় তন্ত্রোক্ত 'বামাচারের' বিকৃত রূপ। বামাচারের কথা যথাস্থানে, অর্থাৎ পঞ্চমকার সাধনার পরিচ্ছেদে বলা যাবে। কিন্তু এখানে এই বিকৃত রূপকে তান্ত্রিকেরা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার সাহায্যে যে শুচিশুভ্র করার চেষ্টা করত, তার কথা বলছি। এজন্য ডাক পড়ত শ্রুতির অর্থাৎ বেদবাক্যের। ছান্দোগ্য উপনিষদে (দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ১-২) বামদেব্যা উপাসনার প্রসঙ্গে বিবৃত মন্ত্রটির মধ্যে রয়েছে 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ'। এই মন্ত্রাংশটিকে কেন্দ্র করে তারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করত, সকল নারীই যে সমভাবে উপভোগ্যা এটা বেদবিহিত। বলা বাহুল্য, বেদ কোন একক ঋষির রচনা নয় এবং বেদের শ্রেয়ঃপন্থার সঙ্গে তন্ত্রের প্রেয়োবাদের মিলন কখনো ঘটেনি। তবে তন্ত্রের খণ্ড খণ্ড অংশের উল্লেখ যে বেদে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে আমরা অথর্ববেদের কথা পূর্বেই বলেছি। এ-সব খণ্ডাংশের ইচ্ছামত কদর্থ করা সহজসাধ্য ব্যাপার।

এবার বৌদ্ধ-তন্ত্রকে অন্তিম-শয়নে বজ্রযানের মহদাশ্রয়ে রেখে বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রশাস্ত্রের প্রথম যুগের আশ্রয়ের কথা বলা যাক।

বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের অসংখ্য পুরনো পুঁথির সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। এ দু-রকম তন্ত্রই অবশ্য বাহ্যত অনেকটা এক-শ্রেণীর, কিন্তু মূলত তারা বিভিন্ন। তাদের এ সাদৃশ্য ও প্রভেদের কথা পরে বলা যাবে।

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সাধারণজনকে আকৃষ্ট করবার জন্য; কারণ বুদ্ধের বিমূর্ত ধ্যান-জগৎ ছিল সাধারণের কাছে অবোধ্য, অগম্য। এদিকে হিন্দুধর্মের উপর যখন দ্বিতীয় / তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ থেকেই পৌরাণিক ধর্মের প্রভাব পড়তে শুরু হল, তখন সেই ধর্মের মূর্ত দেবতারা অনেক বেশি রমণীয় ও আকর্ষণীয় বস্তু বলে হল গৃহীত। ফলে অনেকানেক বৌদ্ধধর্মী, যাদের স্বধর্মে মতি ছিল শিথিল, তারা বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে মন্দিরে শান্তির সন্ধান পেল। ধর্মান্তরিত 'নয়া' বৌদ্ধদের তো কথাই নেই—তারা দলে দলে এসে জুটতে লাগল মূর্ত দেবতার পদতলে। হিন্দু ও মহাযানী বৌদ্ধ, দু দলই জনতাকে নানাভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করার প্রবল প্রতিযোগিতায় লেগে গেল। এই প্রতিযোগিতাই হল তন্ত্রের যৌবনের আশ্রয়। এ আশ্রয় নিয়ে হিন্দুতন্ত্র বেঁচেছে বহুদিন; প্রখ্যাত বাঙালী তান্ত্রিকেরা ষোড়শ / সপ্তদশ শতক পর্যন্ত তন্ত্রশাস্ত্র লিখে গেছেন।

বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্রও ধাপে ধাপে বেড়ে গেল এই প্রতিযোগিতার ফলেই। বৌদ্ধধর্মের অন্তিমকালে তার ধারক ও বাহক হল তিনটি দল: (১) বজ্রযানী, (২) সহজযানী ও (৩) কালচক্রযানী। এদের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদের কথায় আমাদের প্রয়োজন নেই। তন্ত্রগুলি হল সবার সাধারণ সম্পত্তি, তবে মতভেদের ভিত্তিতে সেগুলির যথাযথ ভাগবণ্টনও হয়ে গেল। এদের মধ্যে বজ্রযানী দলই তন্ত্র লিখেছে বেশি, আর লিখেছে 'সিদ্ধ'দের দল। এদের সংখ্যা চুরাশি। সিদ্ধদের, অর্থাৎ যাঁরা তান্ত্রিক মতে সিদ্ধিলাভ

করেছেন. তাঁদের ভাষা 'সন্ধ্যাভাষা' বা 'সান্ধ্যভাষা' অর্থাৎ অস্পষ্ট ভাষা—সোজাসুজি বোঝবার উপায় নেই।

পৌরাণিক দেবদেবীরা অপরূপ মূর্তিতে দেখা দিয়ে বৌদ্ধদের দলে যে ভাঙন ধরাতে শুরু করলেন তা রোধ করার জন্য বজ্রযানীর দল প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। শূন্যের বা নিরাকারের অপরূপত্বের কল্পনা দিয়ে মূর্তির সৌন্দর্যের আকর্ষণকে দূর করা যায় না। তাই বজ্রযানীরা নানাপ্রকার সিদ্ধিদাতার মূর্তি তৈরি করতে শুরু করল। মূর্তি তৈরি হল পাথরে ও ধাতুতে, নানা ভঙ্গীতে। তার চমক বাড়াবার জন্য তাতে মনোরম রংও দেওয়া হল। দলরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য হিন্দুর মূর্তিপূজার অনুকরণ না করে এদের উপায় ছিল না।

আমরা এখানে সিদ্ধির কথা বলেছি। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়-প্রকার তন্ত্রের লক্ষ্য—হয় মুক্তি, নয় নানারূপ সিদ্ধি বা অলৌকিক শক্তিলাভ। এ-সম্পর্কে আরো বিশদ করে পরে বলা যাবে।

বৌদ্ধেরা হিন্দুর তথাকথিত পৌত্তলিকতা অনুকরণ করল বটে, কিন্তু এ মূর্তিপূজার তারা অপরূপ ব্যাখ্যা করল। তারা বলল,

"স্ফূর্তিশ্চ দেবতাকারা নিঃস্বভাবা স্বভাবতঃ।
যথা যথা ভবেৎ স্ফূর্তিঃ সা তথা শূন্যতাত্মিকা॥"

অর্থাৎ দেবদেবীরা সবাই শূন্যেরই বহিঃস্ফূর্তি মাত্র; এঁদের অন্তরাত্মা সবই শূন্য। এঁরা সবাই শূন্যেরই প্রতিমূর্তি।

আর হিন্দুরা? তারা মূর্তিপূজক; কারণ মূর্তি তৈরি করে তারা তাঁর মধ্যে করে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা; পরে তাঁর পূজা করে।

এ প্রতিযোগিতার শেষ অধ্যায়ে দেখা গেল, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবতাদের শক্তিপরীক্ষার বিচার। বিচারক বৌদ্ধের দল দক্ষ ভাটের ভূমিকা গ্রহণ করে ঘোষণা করল যে, বৌদ্ধ দেবতা 'মারীচি'কে হিন্দুদের সকল দেবদেবী পূজা করেন। এমন কি 'মৃত্যুবঞ্চনা তারা'র পূজকের কেশাগ্র পর্যন্ত হিন্দুর বড় বড় দেবতারা, যথা, ব্রহ্মা, ইন্দ্র,

চন্দ্র, সূর্য, শিব, বরুণ, যম ও মন্মথ প্রভৃতি স্পর্শ করতে পারেন না। 'মৃত্যুবঞ্চনা তারা' এমনি শক্তিধারিণী !

শুধু বাক্যবিন্যাসেই এই স্তরের প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটল না। বজ্রযানীরা এ-সব পরম তত্ত্বের চাক্ষুষ প্রমাণও দিল মূর্তি গড়ে ও ছবি এঁকে। গণপতি বা গণেশকে হিন্দুরা এখনকার মতো তখনো সর্বসিদ্ধিদাতা বলে পূজা করত। তাই সেই সর্বসিদ্ধিদাতাকে কোথাও বা সাজতে হল দারোয়ান, কোথাও বা তাঁর আসন হল বৌদ্ধ দেবদেবীর পদতলে। কিন্তু তবু হিন্দুতন্ত্র এগিয়ে চলল পৌরাণিক ধর্মের পাশাপাশি একজোটে। সাধারণ মানুষ পুরাণ-পাঠে আসক্ত হল, আর কথকতার জোরে পুরাণের চমকপ্রদ গল্পগুলি ছেলে-বুড়ো সবার মনেই রং ধরিয়ে দিল।

তন্ত্র যখন হিন্দুধর্মের ঘরে এসে জুড়ে বসল, তখন বৈদিক হিন্দু-ধর্মের রূপ বদলে তা হয়ে উঠল কিছুটা বৈদিক, কিছুটা পৌরাণিক, আর কিছুটা তান্ত্রিক; সূক্ষ্মবিচারে পৌরাণিক ও অবৈদিক। কাজেই হিন্দুধর্ম হয়ে গেল মূলত বৈদিক ও অবৈদিক ধর্মমতের সংমিশ্রণ। অন্তত শ পাঁচেক বছর যে সারা ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম তন্ত্রপ্রধান হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

পূর্ণমর্যাদায় তান্ত্রিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটল হিন্দুর ঘরেই; অর্থাৎ কতকগুলি আচার-বিচারের স্তর থেকে তা ক্রমে মুক্তিসাধনার একটা বিশিষ্ট পথ হিসাবে গণ্য হল হিন্দুদের সর্বদলীয় সমর্থনে। বেদাচারী, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সকলেই তন্ত্রের ভিত্তিতে যার যার দর্শনশাস্ত্র রচনা করল, যেমন বেদ ও উপনিষদের ভিত্তিতে হিন্দুরা রচনা করেছিল তাদের ষড়্‌দর্শন।

হিন্দুতন্ত্র থেকে যে পাঁচটি দর্শনের সৃষ্টি হল, আমরা কুলার্ণব-তন্ত্র থেকে এখানে তার একটা মোটামুটি বিবরণ দিয়ে যাব।

উপনিষদ্ জগতে সাধকের লক্ষ্য যেমন 'অমৃতত্ব' লাভ, তন্ত্র জগতে সাধকের লক্ষ্যও তেমনি 'পাশমুক্তি'। এই পাশের সংখ্যা

আট; যেমন দয়া, মোহ, লজ্জা, কুল অর্থাৎ উচ্চকুলে জন্মের গর্ব, শীল অর্থাৎ কৃষ্টির গর্ব, বর্ণ বা চাতুর্বর্ণ্যবিভাগে বর্ণ-প্রাধান্যের গর্ব ইত্যাদি। জীবের পাশমুক্তি হলেই তার মুক্তিলাভ ঘটে। এই পাশমুক্তির কথাই শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-কাহিনীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। জীবত্বরূপী গোপীকে শিবত্ব লাভের জন্য ছাড়তে হবে লজ্জা, ছাড়তে হবে সাংসারিক যত সংস্কার—কুল, মান, সমাজ-বন্ধন। নইলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাওয়া যাবে না। আমাদের বহু-প্রচলিত একটি সহজ বাণীর মধ্যেও সেই তত্ত্ব :

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়
তিন থাকতে নয়।

এ-সব পশুত্ব বজায় থাকতে পশুরাজের কাছে যাওয়া চলে না।

কুলার্ণবতন্ত্রে পাশমুক্তির সাতটি পথ রয়েছে বলে বলা হয়েছে। পথ মূলত পাঁচ, কারণ এর একটিতে তিনটি স্তরের সমাবেশ। এই পাঁচটি পথকে কেন্দ্র করেই পাঁচটি বিভিন্ন দর্শন-শাখার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা নিচে সংক্ষিপ্ত করে তার ফিরিস্তা দিচ্ছি।

ক. বেদাচার বা কর্মপন্থা; অন্তরের শুদ্ধি অপেক্ষা দৈহিক শুদ্ধির দিকেই এর দৃষ্টি বেশি। এ পথ মূলত শাস্ত্রোপদেশের প্রতি বিশ্বাস-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

খ. বৈষ্ণবাচার বা ভক্তিপন্থা। অন্ধবিশ্বাস এ পথের ভিত্তি হলেও পরমব্রহ্মের অসীম রক্ষা-শক্তির ধারণা এ বিশ্বাসের মধ্যে ওতপ্রোত।

গ. শৈবাচার বা মোটামুটি জ্ঞান ও ধ্যানের পথ। উড্রফ এটিকে 'ক্ষত্রিয়-পন্থা' বলে উল্লেখ করেছেন। এ পথ রচিত হয়েছে প্রেম, ক্ষমা ও যোগলব্ধ সিদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টার সংযোগে।

ঘ. দক্ষিণাচার বা কর্ম। এটি ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব বিশ্লেষণে জাত পন্থা। উড্রফ বলেছেন, এ পথে ধ্যান ও ধারণা ত্রয়ী শক্তির— ক্রিয়া, ইচ্ছা ও জ্ঞানের। তাঁর মতে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও

শৈবাচার সবই ‘পশু’স্বভাব সাধারণ মানুষের পথ। দক্ষিণাচারেই প্রথম মানুষ পাশমুক্তির আস্বাদ পায়।

‘পশু’স্বভাব কাকে বলে? যে জীব পাশবদ্ধ সে-ই পশু। এই ‘পাশ’ আবার তন্ত্রমতে তিনপ্রকার: পশুত্বসাধক ‘মল’ বা অবিদ্যা, কর্ম ও মায়া। এই ত্রিবিধ পাশ-এর নিবৃত্তিকেই ‘পাশমুক্তি’ বলা হয়।

৬. বামাচার বা নিবৃত্তি মার্গ। এ পন্থায় সমস্ত বহির্মুখী প্রবৃত্তিকে করতে হবে অন্তর্মুখী। গুরু ছাড়া এ দুর্গম পথ অগম্য, অভেদ্য। এ পথে প্রবৃত্তিকে এমনভাবে সংযত ও সংহত করতে হবে যে নিজ অন্তর্দ্বন্দ্বেই তার আত্মবিলোপ ঘটবে আর প্রবৃত্তি পরিণত হবে নিবৃত্তিতে। মানুষের প্রবৃত্তি স্বভাবতই নিম্নগামী। এই অপূর্ব সংহতির ফলে তা ঊর্ধ্বগামী হয়ে হবে মহাশক্তিতে পরিণত।

তন্ত্রের মর্মবাণী ও পঞ্চ‘ম’কার সাধনার কথায় এই বামাচারের সম্পর্কে বিশদ করে বলা যাবে। এই বামাচারেরই বাম, কৌল ও সিদ্ধান্ত—এই তিনটি স্তর রয়েছে।

যদিও আমরা তন্ত্রের এই বিভিন্ন পথের কথা পৃথক করে দেখিয়েছি, মূলত এগুলিকে তন্ত্রপন্থারই বিভিন্ন স্তর বলে বলা চলে। মনে হয়, এ স্তর-বিভাগে বেদাচারকে যে সর্বনিম্নে রাখা হয়েছে তার কারণ তন্ত্র ও বেদের অসীম বিরোধ।

হিন্দুতন্ত্রে শৈবাচারের জন্ম হয়েছে বৈষ্ণব ও শাক্তের চিরন্তন দ্বন্দ্ব মেটাতে। কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করে বলা যাক।

বিষ্ণু বৈদিক দেবতা, কিন্তু শিব মূলত অবৈদিক। বিষ্ণু অভিজাত দেবতা অথবা অভিজাতশ্রেণীর মানুষের দেবতা; শিব সর্বজনীন, বলা যেতে পারে—জনতার দেবতা। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়া বিষ্ণুপূজা হয় না, কিন্তু শিবপূজায় সকলেরই অধিকার রয়েছে—স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির। বিষ্ণুপূজা সাধারণত হয় ষোড়শোপচারে, শিবপূজা একটিমাত্র বেলপাতা দিয়েও হয়।

বিষ্ণু ও শিব সৃষ্টি ও লয়ের দেবতা। এঁরা যে মূলত একই,

এ কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে চণ্ডীতে। সেখানে নারায়ণী বা বিষ্ণুর শক্তি ও শিবা বা শিবানী অর্থাৎ শিবশক্তি যে এক তা বলা হয়েছে।

এই শিবা বা শিবানীই পরে কালিকারূপে দেখা দিয়েছেন। এই শিবশক্তি-পূজকেরাই শাক্ত; এঁরা মূলত সকল কাজকেই পূজা বলে গ্রহণ করেন—এমন কি দৈনন্দিন কাজকেও। এ দর্শনেরই চরম অবনতির স্তরে 'ডাকাতে-কালীপূজা'। শাক্ত-দর্শনের মূলকথা এটি-ই। দেবী কালিকার পূজায় বিশেষ আচার-বিচারের ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। পূজকও যে-কেউ হতে পারে—পূজাও চলে যত্রতত্র। অনেকের মতে, কালীপূজা প্রথম প্রবর্তিত হয়েছে তিলী ও কুমারের ঘরে; অনেক পরে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উচ্চবর্ণের চণ্ডীমণ্ডপে।

অভিজাত বিষ্ণুপূজার কারাপ্রাচীর ভেঙ্গে এল সাধারণ বৈষ্ণব-তত্ত্বের স্নিগ্ধধারা যার উপজীব্য দেবতার মনুষ্যলীলা। এদিকে শক্তি-সাধনার উষ্ণ রুধির-স্রোতকে মাতৃস্তন্যে পরিণত করলেন দেবী কালিকা, যিনি শিবশক্তি। শৈবের সেতু-সংযোগ রচনা করল শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে দুস্তর নদীর, আর এ সামঞ্জস্য সাধন করলেন সর্বজনীন, সর্বসিদ্ধিদাত্রী, আশুতুষ্টা শিবশক্তি মা কালিকা। দেবী কালিকা কি তাই বাঙালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় দেবতা?

শৈবতন্ত্র দুভাগে বিভক্ত: আগম ও নিগম। দুই-ই বিষ্ণুর অনুমোদিত। তবে সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রই হর-পার্বতীর মুখ-নিঃসৃত। আগমে শিব পার্বতীকে তন্ত্রকথা বলছেন; নিগমে পার্বতী বলছেন শিবকে। আগম ও নিগম কথা-দুটি যেরূপে ব্যুৎপন্ন হয়েছে বলে কথিত* তা বলা যাচ্ছে:

আগম = আগত + গত + মত।
নিগম = নির্গত + গিরীশ + মত।

'মত' অর্থে বিষ্ণুর অনুমোদিত। সাধারণ মতে শিব ও শক্তির

---

* আগতং শিব-বক্ত্রেভ্যো গতং চ গিরিজাশ্রুতৌ।
মতং চ বাসুদেবেন তস্মাদাগম্ উচ্যতে॥

কথোপকথন-ভিত্তিক শাস্ত্রকেই আগম বলা হয়। তন্ত্রের সংসারে আগমের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে তার জ্ঞাতিভাই 'যামল'*। একই গোষ্ঠীভুক্ত হলেও আগম ও যামলে কিছু কিছু প্রভেদ রয়েছে। যথাস্থানে তা বলা যাবে।

শৈবতন্ত্রের এক অংশ অধিকার করে রয়েছে 'ভূত ডামর', যার অর্থ উন্মত্ত ভৈরব। এর মধ্যে আছে ভূত-ভূতিনীসিদ্ধির কথার সঙ্গে নানা সাধনপ্রণালীর অপূর্ব সমাবেশ। কৈঙ্করী সাধন, অপ্সরা সাধন, যক্ষিণী সাধন, কিন্নরী সাধন প্রভৃতির সঙ্গে কুলসুন্দরী, বিজয়সুন্দরী, বিমলসুন্দরী, মধুমত্তসুন্দরী, এমন কি ধ্বংসসুন্দরীকেও ভার্যারূপে লাভ করার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। সাধনায় তুষ্ট হলে এঁরা সাধকের ভার্যা হন; সাধক 'পঞ্চসহস্র' বৎসর পৃথিবীতে নানা সুখ ভোগ করে, সুন্দরীর সাহচর্যে স্বর্গে যান। পরে স্বর্গসুখ উপভোগ করে সাধারণত রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

বেদের আশ্রয় শুধু উচ্চবর্ণের মুষ্টিমেয় মানুষ; কিন্তু তন্ত্রের আশ্রয় হল আপামর জনসাধারণ, স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে। "সর্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ"—এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে গৌতমীয় তন্ত্র।

তন্ত্রসাধনায় জাতিভেদের কথা ওঠে না, সকলেরই তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করার অধিকার রয়েছে; সকলেই তান্ত্রিক মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারে; কারোরই তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও গায়ত্রী পাঠ করতে বাধা নেই।

তারপর চক্রে বসতে পারে চণ্ডালও। 'চক্র' কাকে বলে তা পরে আসবে। চক্রে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল একত্র বসলেও তারা একই জাতের শামিল হয়ে যায়, অবশ্য সে চক্র যতক্ষণ না ভেঙ্গে যায়। চক্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে কোনো প্রভেদ নেই; তারা এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন ও একই খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। চক্রের শেষে

* তন্ত্রশাস্ত্রের পরিভাষায় যামল শব্দের সাধারণ অর্থ—শিব ও শক্তির পরস্পর-মিলিত রূপ।

তারা যার যার পূর্বতন জাতি ও সামাজিক স্থান ও আসন লাভ করে।

তন্ত্রের আশ্রয়স্থল খুঁজতে গিয়ে আমরা কি কি পেলাম ?

বেদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বাদ দিলে, তন্ত্র প্রথম আশ্রয় পেয়েছে বৌদ্ধের ঘরে। মহাযানীর কাঁধে ভর করে সে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে। মহাযানী বৌদ্ধদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে হিন্দু পুরাণ ; হিন্দুতন্ত্রের জন্মও হয়েছে এই সূত্রেই।

বৌদ্ধতন্ত্র শেষপর্যন্ত বজ্রযানের পঙ্কিল জলে ডুবে মরেছে, কিন্তু হিন্দুতন্ত্র ক্রমে ক্রমে পঞ্চোপাসক সমগ্র হিন্দু সমাজেই ছড়িয়ে পড়েছে। এর কারণ একদিকে তন্ত্রের উদার বাণীর আকর্ষণ, অন্যদিকে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের সামঞ্জস্য-বিধানের ক্ষমতা। তন্ত্র যে চার-পাঁচ শ বছর সারা ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের প্রধানতম অবলম্বন ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এখনো আঞ্চলিক-ভাবে হিন্দুধর্ম তন্ত্রপ্রধান এবং সর্বত্রই হিন্দুধর্ম কিছুটা বৈদিক, কিছুটা তান্ত্রিক।

বৈষ্ণবতন্ত্রের সঙ্গে শাক্ততন্ত্রের মিলন ঘটিয়েছে শৈবতন্ত্র। এই অপূর্ব সামঞ্জস্যসাধন করেছেন শিবশক্তি দেবী কালিকা, যাঁর জন্ম অভিজাত পল্লীতে ঘটেনি—ঘটেছে তথাকথিত অন্ত্যজদের গৃহে। তন্ত্র আশ্রয় দিয়েছে সর্বজনকে, তাই তন্ত্রও আশ্রয় পেয়েছে সর্বগৃহে।

তৃতীয় অধ্যায়

তন্ত্রপ্রধান অঞ্চল ও তান্ত্রিক বিধান

মাতৃক্রোড় ছেড়ে তন্ত্রশাস্ত্র প্রথম আশ্রয় পেল বৌদ্ধ-বিহারে। তারপর বেধে গেল বিহারের মধ্যেই বিষম দলাদলি যার শেষ হল একটা মূলগত আদর্শের বিরোধ-ভিত্তিক ভাগাভাগি দিয়ে। ভাগীদার দু' দলই অবশ্য ছড়িয়ে পড়ল ভারতবর্ষের সর্বত্র, কিন্তু হীনযানীরা প্রবল হল দক্ষিণাপথে, আর উত্তরাপথে প্রতিষ্ঠা লাভ করল মহাযানীরা।

কিন্তু 'ভাগের মা' শেষ পর্যন্ত গঙ্গা পেল না। বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে বিলয় পেল ভারতবর্ষেই। অবশ্য ভাগাভাগিই এর একমাত্র কারণ নয়; অন্যান্য বিশেষ কারণও রয়েছে। হীনযান দক্ষিণাপথ থেকে বিদায় নিয়ে তার মোটামুটি স্থায়ী আসন পাতল শ্রীলঙ্কায়। এদিকে মহাযান তন্ত্রকে আশ্রয় করে তার জয়যাত্রা শুরু করল পূর্বদিকে। তন্ত্রকে লালনপালন করতে গিয়ে, প্রতিবেশী হিন্দুর পুরাণের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জাঁকজমকে লাগল বৌদ্ধধর্মের চোখে ধাঁধা। ফলে বৌদ্ধধর্মের বিমূর্ত ভাবগুলি মূর্ত হল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে। এই ধর্মের পরিণতি ঘটল বজ্রযানে যা বহুকাল সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ভারতবর্ষের তদানীন্তন পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ অঙ্গে, বঙ্গে, কলিঙ্গে ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে। এ দেশগুলির আধুনিক নাম যথাক্রমে বিহারের পূর্বাঞ্চল যার সিংহদ্বার ভাগলপুর; পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ অবিভক্ত বাঙলা; উড়িষ্যা ও আসাম। অনেকের মতে বজ্রযানের জন্মই হয়েছে চন্দ্রদ্বীপে অর্থাৎ আধুনিক বাংলাদেশের বাখরগঞ্জে অর্থাৎ বরিশালে।

তা যাই-ই হোক, তন্ত্র-সংবলিত বৌদ্ধধর্ম যে ভারতবর্ষে ভগবান্

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের অন্তিম রূপ তাতে সন্দেহ নেই। এই অন্তিম রূপের জ্যোতিই বহুকাল ভাস্বর করে রেখেছিল পূর্বাঞ্চলকে ; তার শেষরশ্মি মিলিয়েও গেল এই পূর্বাঞ্চলেই। এই অন্তিম রূপেরই চিহ্ন রয়েছে নেপালে, সিকিমে, ভুটানে, চীনে, জাপানে ও দূরপ্রাচ্যে। হয়ত এর মধ্যে বাঙালীরই নানা কীর্তিকাহিনী জড়িত রয়েছে।

বাঙালীর সঙ্গে এর সম্পর্কের কথাটা নিতান্ত অমূলক নয়। বজ্রযানকে কেন্দ্র করে এই বাঙলায়ই গড়ে উঠেছিল একটা বিশেষ ধরনের ভাস্কর্য যা মনোহারিত্বে অপরূপ। হয়ত এর জন্ম হয়েছিল দশম শতকে অথবা তার কিছু পরে, তবে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলমানদের বাঙলায় আগমনের পূর্বে। এই মনোরম ভাস্কর্যের চিহ্ন রয়েছে রাজসাহীতে, ঢাকায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, বিক্রমপুরে, দিনাজপুরে ও কুমিল্লায়।

জাভার বরবুদুরের মন্দির জুড়েই এই বজ্রযানের নানা তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি। বাণিজ্যসূত্রে বাঙালী বণিকেরা যে জাভায় একটা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নেই, আর সেই যোগাযোগের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বজ্রযান। সেকালে তাম্রলিপ্তি বা অধুনাতন তমলুকই ছিল বাঙলার প্রসিদ্ধ বন্দর।

মুসলমানদের আক্রমণের ফলে বৌদ্ধবিহারগুলির যত ক্ষতি হয়েছে হিন্দুমন্দিরগুলির তত হয়নি। এর কারণ বৌদ্ধবিহারের মধ্যে ধনরত্নও থাকত অনেক, আবার লোকসংখ্যা অর্থাৎ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এ দেশের ধর্ম-সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানেরা বিহারগুলিকে দুর্গ বলে মনে করত আর ভিক্ষুদের ভাবত সৈন্য। তারপর বিহার লুঠ করলে অর্থও মিলত অজস্র। হিন্দুমন্দিরের মধ্যে ধনরত্নও বেশি থাকত না, আবার লোকজন তো প্রায় থাকতই না বলা চলে।

এই অত্যাচারের ফলে অনেক ভিক্ষু পালিয়ে বাঁচল নেপালে। তারা সঙ্গে নিয়ে গেল বজ্রযানের তত্ত্ব আর বাঙলার সেই অপূর্ব

ভাস্কর্যের নিদর্শন। সে ভাস্কর্য নেপালে অচিরেই প্রতিষ্ঠালাভ করল বটে, কিন্তু বেশি দিন অবিকৃত রইল না। সে দেশের ভাস্কর্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে তা নবকলেবর ধারণ করল।

কারো কারো মতে ভারতবর্ষের আদিম তন্ত্রপীঠ পাঁচটি: জলন্ধর, পূর্ণগিরি, শ্রীপর্বত, ওদীয়ান ও কামাখ্যা। এঁরা মনে করেন, তন্ত্রশাস্ত্র বহিরাগত, আর তার প্রবেশপথ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। কিন্তু জলন্ধর (পাঞ্জাব) ও কামাখ্যার (আসাম) মধ্যে যে বিরাট দূরত্ব তাতে এ দুটি স্থানকেই 'আদিম' বলতে দ্বিধা হয়। হয় পশ্চিম আদিম হবে, নয় পূর্ব; হয় জলন্ধর নয় কামাখ্যা।

সে বিতর্ক থাক। কিন্তু বজ্রযানের কথাটা ভুললে চলবে না। এটা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অন্তিম রূপ, আর সে রূপেরই 'পীঠ' বা প্রধান তীর্থ হল চারটি: কামাখ্যা, শ্রীহট্ট, পূর্ণগিরি ও উড্ডীয়ান বা ওদীয়ান।

কালিকাপুরাণ জলন্ধরকে বাদ দেয়নি। তাই হিন্দু-তান্ত্রিকের মতে এ-সব পীঠে দেবীর মূর্তি চারটি: ওদীয়ানে কাত্যায়নী, কামরূপে কামাখ্যা, পূর্ণগিরিতে পূর্ণেশ্বরী আর জলন্ধরে চণ্ডী।

এর মধ্যে কামরূপ-কামাখ্যা ও জলন্ধর আমাদের পরিচিত, পূর্ণগিরি ও ওদীয়ান বা উড্ডীয়ান পরিচিত নয়। পুরানো পুঁথিতে পূর্ণগিরির খোঁজ মেলেনি; কারো মতে এটির অবস্থিতি ছিল আসামেই, আর এর অন্য নাম পুণ্যতীর্থ। উড্ডীয়ান কারো মতে উজ্জয়িনী, কেউ বা বলেন এটি 'উরেন'-এর বনাম মাত্র; উরেন বিহারের মুঙ্গের জেলায়। সেখানে বৌদ্ধবিহারের বেশ-কিছু ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

আমরা এ-সব তর্কবিতর্কের মধ্যে আর বেশিদূর যেতে চাই না। তবে এটা সহজবোধ্য যে বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র উভয়েরই পুরনো পীঠগুলি মূলত পূর্বাঞ্চলেই অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলেই এদের রাজত্ব।

এবার বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে মূলগত প্রভেদ এবং আগম ও যামল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

বৌদ্ধ ও হিন্দু দু দলেরই তন্ত্রশাস্ত্রের পুঁথি সংখ্যাতীত। এর মধ্যে অনেকগুলি নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো যা বর্তমান তার ইয়ত্তা নেই বলা চলে। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র বাহ্যত একই রকমের বটে কিন্তু তাদের মূলগত প্রভেদ পাঠকমাত্রের কাছেই ধরা পড়বে। এ প্রভেদের সূত্র তিনটি : (ক) বিষয়বস্তু অর্থাৎ যে-সব প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে; (খ) দার্শনিকতত্ত্ব অর্থাৎ বৌদ্ধতন্ত্রে বৌদ্ধদর্শনের ছায়াপাত ঘটেছে, আর হিন্দুতন্ত্রে হিন্দুদর্শনের আভাস রয়েছে। (গ) ধর্মতত্ত্বে অর্থাৎ বৌদ্ধতন্ত্রে রয়েছে বৌদ্ধধর্মের প্রশস্তি আর হিন্দুতন্ত্রে হিন্দুধর্মের বা পুরাণের।

প্রভেদটা মূলগত, তাই প্রাঞ্জল।

তারপর আরো একটা কথা আছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের সংজ্ঞায়ও প্রভেদ রয়েছে। যেমন, যে-সব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা না থাকলে হিন্দুরা পুঁথিটিকে তন্ত্রশাস্ত্রই বলবে না, তা হল : (ক) পৃথিবীর সৃষ্টি ও লয়ের কথা; (খ) অতীন্দ্রিয় মন্ত্রশক্তির কাহিনী; (গ) স্বর্গ ও তীর্থাদির বিবরণ ; (ঘ) চতুরাশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসে মানুষের কর্তব্য ; (ঙ) সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ; (চ) প্রেতাদির বাসস্থানের বৃত্তান্ত ; (ছ) স্ত্রী-পুরুষের চরিত্র-নির্ণয় ; (জ) রাজার কর্তব্য প্রভৃতি।

বিষয়বস্তু আরো অনেক রয়েছে; সেগুলিতে আমাদের প্রয়োজন নেই। কারণ সে-সব আমাদের আলোচ্য নয়।

মোটের ওপর বৌদ্ধ ও হিন্দুদের তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভেদ বোঝার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না।

হিন্দুরা আগম ও যামল-আখ্যাধারী পুঁথিকে তন্ত্রের পঙ্‌ক্তি থেকে দূরে রেখেছে।

আগম-নিগমের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এটি তন্ত্র-সাহিত্যের

অঙ্গ সন্দেহ নেই, কিন্তু তন্ত্রাতিরিক্ত যে-সব বিষয়বস্তু আগমে এই পঙ্‌ক্তি-প্রভেদ রচনা করেছে তার একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া যাক। এতে থাকবে (ক) পৃথিবীর সৃষ্টি ও লয়ের কথার সঙ্গে নানা দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি ও সিদ্ধিলাভের উপায়; (খ) সংখ্যা গুণে পৌনঃপুনিক মন্ত্রপাঠ; (গ) 'কৃষ্ণ'-ষট্‌কর্মের কথা; (ঘ) ধ্যান ও নানাবিধ কৃচ্ছ্র-সাধনের বিবরণ।

এ ধ্যান কি মূর্ত না অমূর্ত ব্রহ্মের? আগমের মতে, প্রাথমিক ধ্যান মূর্তের অর্থাৎ স্থূল ধ্যান; পরে অমূর্ত ধ্যান—সচ্চিদানন্দের বা সূক্ষ্ম ধ্যান। ব্রহ্ম যদিও নির্গুণ, নিরবয়ব, আনন্দ-জ্যোতি-স্বরূপ, তবুও মুক্তিকামীর সাহায্যার্থে তিনি সগুণাত্মক হন। ধ্যান যোগের একটি প্রধান অঙ্গ। সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় প্রকার ধ্যানের লক্ষ্য একই। সে লক্ষ্য হল মনের স্থিরতালাভ, চিন্তাতরঙ্গ থেকে তাকে মুক্ত করা। ধ্যানেরই চরম অবস্থা সমাধি।

সমাধির কথা বলতে গিয়ে কুলার্ণবতন্ত্র বলেছে:

"পূজাকোটিসমম্ স্তোত্রম্, স্তোত্রকোটি সমো জপঃ।
জপকোটিসমম্ ধ্যানম্, ধ্যানকোটি সমো লয়ঃ॥"

কোটি পূজা একটি স্তোত্রের সমান; কোটি স্তোত্র একটি জপের; কোটি জপ একবার ধ্যানের আর কোটি ধ্যান একবার সমাধির।

ধ্যানের কথা ছেড়ে এবার যামলের বৈশিষ্ট্যের কথায় আসা যাক। যামল-গ্রন্থগুলির মধ্যে 'আদি', 'গণেশ', 'আদিত্য', 'ব্রহ্ম', 'বিষ্ণু' ও 'রুদ্র'-যামল বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। যামলে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে আছে কিছু কিছু ফলিত জ্যোতিষ, নিত্যকর্মপদ্ধতি, পূজোৎসবের বিবরণ, চাতুর্বর্ণ্যের কাহিনী আর কালোচিত নিয়ম-ব্যবস্থার কথা।

হিন্দুতন্ত্রের যে-সব লক্ষণ বলা হয়েছে তা ছাড়াও অনেক সময়ে তাতে আরো নানা বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এ-সব

বিষয়ের মধ্যে সাধারণত থাকে ফলিত জ্যোতিষ, কোষ্ঠী-বিচার, নানা ভেষজ ও রসায়ন বিদ্যার কথা। বলা বাহুল্য, তন্ত্রশাস্ত্রের মূল কথার সঙ্গে এ-সব বিষয়বস্তুর বিশেষ সম্পর্ক নেই।

বৌদ্ধতন্ত্রের কথা বাদ দিয়ে এবার আমরা পূর্বাঞ্চলে হিন্দুতন্ত্রের প্রাধান্যের কারণ অনুসন্ধান করব।

বহুপূর্ব কাল থেকেই ভগবান্ বুদ্ধকে হিন্দুরা দেবতা 'শান্তমন' বলে গ্রহণ করেছিল। দ্বাদশ শতকে জয়দেবের গীতগোবিন্দে তাঁকে হিন্দুর দশাবতারের অন্যতম বলে ঘোষণা হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে বিভেদকে অনেকাংশে দূর করে দিল। ফলে, হিন্দুর মন্দিরে অন্তত মহাযানী বৌদ্ধদের পক্ষে ভগবান্ বুদ্ধের উপাসনার দ্বার রইল খোলা।

এদিকে পূর্বাঞ্চলে বজ্রযান প্রাধান্যলাভ করল বটে. তবে সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থ প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াল হিন্দুতন্ত্র। হিন্দুতন্ত্রের শক্তিমান্ সহযোগী পুরাণ আর পুরাণের দেবদেবীর আকর্ষণ সাধারণ লোকের কাছে বজ্রযানের দেবদেবীর চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। তার ওপর শুধু গৃহ্যসূত্রের দশসংস্কার মানলেই বৌদ্ধেরা হিন্দুসমাজে গৃহীত হবে বলে পাঁতি দিয়েছিলেন স্মৃতির পণ্ডিতেরা। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কোথাও কোনো শক্তিশালী বৌদ্ধ-রাজাও ছিল না। বৌদ্ধ-সমাজের চূড়ামণি বণিকগোষ্ঠী হিন্দুর মন্দিরেও দীপ জ্বালাতে শুরু করেছিল, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-বিহারেও ধূপ দিত। কিন্তু তাদের অনেকেই ক্রমে ক্রমে মন্দিরের দিকেই ঝুঁকে পড়ল। বজ্রযানের নদীতে ভাঁটা এসে গেল।

পূর্বাঞ্চল পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। তার অর্থ, বৈদিক বিধান ও পূজা এ দেশে কোনোদিনই শক্ত শিকড় গেড়ে বসেনি। এ অঞ্চলের অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল আদিবাসী, অথবা আদিবাসীর সংমিশ্রণে জাত নানা সঙ্কর জাতি। সাধারণত এই আদিবাসীরা ছিল মাতৃ-কেন্দ্রিক, পিতৃকেন্দ্রিক নয়। তাই এরা ছিল বিশেষ করে দেবীপূজক। কিন্তু বেদ-বিধানে দেবীপূজার ঠাঁই নেই বললেই

চলে। কাজেই আদিবাসী শবর জাতির মহাদেবী যখন পুরাণে ও তন্ত্রে চণ্ডী বা মা-দুর্গারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন, অন্ত্যজ-গৃহের কালী-পূজার মন্ত্র যখন শুদ্ধ সংস্কৃতে হিন্দু-প্রধানদের চণ্ডীমণ্ডপে উচ্চারিত হতে লাগল, তখন পুরাণ ও হিন্দুতন্ত্রের আঞ্চলিক জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে গেল। শাক্ততন্ত্রের প্রাধান্য দেখা দিল; বেদোক্ত রুদ্র বা শিবের হল আদ্যাশক্তিলাভ আর বিষ্ণুর অঙ্কে বসলেন লক্ষ্মী।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য দুটি। এক : শ্রেয়োলাভ অর্থাৎ নির্বাণ বা ব্রহ্মত্বলাভ; দুই : সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ বিভূতিলাভ বা যোগলব্ধ ঐশ্বর্যলাভ। বিভূতি হল সাধনার বলে উপার্জিত রত্ন।

হিন্দুতন্ত্রে আটপ্রকার মুখ্যসিদ্ধির কথা দেখা যায় : কোথাও কোথাও আঠারো ও চব্বিশটি সিদ্ধির কথাও বলা হয়েছে বটে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে চৌত্রিশ প্রকার সিদ্ধির উল্লেখ রয়েছে, অবশ্য মুখ্য অষ্টসিদ্ধি সমেত। ষোড়শ শতকের বিশিষ্ট বাঙালী তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে সিদ্ধিগুলিকে উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে যে যে আটটি সিদ্ধি মুখ্য বলে ধরা হয়, আমরা এখানে তার একটা বিবরণ দিচ্ছি এবং তার সঙ্গে তাদের সংক্ষেপিত অর্থেরও উল্লেখ করছি। এ-সব সিদ্ধিলাভের জন্য যে-সব সাধনার পথ তন্ত্রে রয়েছে তার আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। তারপর, যথাযোগ্য গুরুর সাহায্য ছাড়া সে পথে পদক্ষেপ করাও যায় না।

হিন্দুর মুখ্য অষ্টসিদ্ধি

১. অণিমা : শরীরকে অণুপ্রমাণ করার ক্ষমতা।
২. লঘিমা : ইচ্ছামত নিজদেহ লঘু করার শক্তি।
৩. মহিমা : নিজেকে বহুগুণ বর্ধিত করার ক্ষমতা।

৪. প্রাপ্তি : ইচ্ছামত সম্ভব-অসম্ভব যে-কোনো বস্তু আহরণের শক্তি।

৫. প্রাকাম্য : অপরিসীম স্বাধীনতা।

৬. ঈশিত্ব : স্থাবর-অস্থাবর সকলের ওপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা।

৭. বশিত্ব : ইচ্ছানুসারে প্রাকৃতিক শক্তিকে পরিচালনা করার শক্তি।

৮. কামাবসায়িত্ব : বাসনা-সমাপনের শক্তি; কামনাকে বাস্তবরূপ দেবার ক্ষমতা।

বৌদ্ধের মুখ্য অষ্টসিদ্ধি

১. খড়গ : যে মন্ত্রপূত খড়গ নিয়ে যুদ্ধ করলে জয় অবশ্যম্ভাবী তা করার শক্তি।

২. অঞ্জন : ওপর থেকে মাটির নীচে প্রোথিত ধনরত্ন দেখার শক্তি।

৩. পদলেপ : এমন একটি প্রলেপ বা ভেষজ তৈরি করার শক্তি যা মেখে নিজে অদৃশ্য থেকে সর্বত্র ঘোরাফেরা যায়।

৪. অন্তর্ধান : সহসা অদৃশ্য হওয়ার শক্তি।

৫. রসরসায়ন : (ক) যে-কোনো ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করার শক্তি।
(খ) 'অমৃত' অর্থাৎ যা খেলে মানুষ অমর হবে তা তৈরি করার শক্তি।

৬. খেচর : আকাশপথে ভ্রমণ করার শক্তি।

৭. ভূচর : পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে যে-কোনো সময়ে যাবার শক্তি।

৮. পাতাল : পাতালে, যেখানে ভূত-প্রেতাদির বসবাস, ইচ্ছামত যাবার শক্তি।

আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ অষ্টসিদ্ধির সাদৃশ্য পূর্বাঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মমতের মিশ্রণের ফল। বজ্রযানের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ অষ্টসিদ্ধির অনেকগুলির গা থেকে বৌদ্ধ-চিহ্ন উঠে গেছে, যেমন গিয়েছে বজ্রযানের পীঠস্থান কামাখ্যা থেকে তার বৌদ্ধ-ছাপ। কামাখ্যা কখন থেকে যে হিন্দুতন্ত্রের পীঠস্থানে পরিবর্তিত হয়েছে তা অজ্ঞাত। সিদ্ধির মধ্যে 'রস-রসায়নের' কথাই ধরা যাক। বহুকাল থেকেই (ক) ও (খ) এ দুটি শক্তিলাভ মানুষ মাত্রেরই কামনা—পৃথিবীর সর্বত্র। পূর্বাঞ্চলে, বৌদ্ধভিক্ষুকে নয়, হিন্দু সন্ন্যাসীকে এ কার্যে মন্ত্রসিদ্ধ বলে ধরে নিতে কারো দ্বিধা হয় না।

বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ অষ্টসিদ্ধি সর্বজনবোধ্য, স্পষ্ট এবং সাধারণ জনের কাছে অধিকতর লোভনীয়। বৌদ্ধ-ছাপ না থাকায় সেগুলি হিন্দুর অষ্টসিদ্ধির সঙ্গে মিশে একযোগে তন্ত্র-মাহাত্ম্য বাড়িয়ে দিল। তারপর কৃষ্ণ ষট্‌কর্মের কথা। নানা আপদ-বিপদের প্রতিরোধক হিসাবে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের মূল্য গৃহস্থের নিকট সেকালে এমনিই ছিল অপরিসীম; তার ওপর, পুরোহিতের দল নিজেদের স্বার্থেই একে করে তুলল অপরিহার্য। ক্রমে বৈদিক পূজার সঙ্গে এই তান্ত্রিক আচারের অপূর্ব মিলন হল; বেদবিহিত বিষ্ণুপূজার অঙ্গ হিসাবে জুড়ে বসল এই শান্তি-স্বস্ত্যয়ন—বিষ্ণুকে তাঁর প্রিয় তুলসীপত্র দানের মধ্য দিয়ে। আজও পূর্বাঞ্চলে হিন্দু গৃহস্থের গৃহে এ মিলনোৎসব অব্যাহত রয়েছে।

বাকি পাঁচটির রহস্য-ভাণ্ডার রয়েছে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর থলির মধ্যে। এ-সব আচারে ও প্রক্রিয়ায় সেকালে তো প্রায় দেশজোড়া মানুষেরই ছিল অপার বিশ্বাস; এখনো, এই বিংশ শতকের শেষপাদে যে তার কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এখনো শিক্ষিত পরিবারে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর ডাক পড়ে বশীকরণ-মারণ-উচ্চাটনের ব্যবহারিক ফললাভের জন্য। এ-সব প্রক্রিয়ায়

অবিশ্বাসীকে এখনো অনেকে কৃপার পাত্র বলে মনে করে। পূর্বাঞ্চলে তন্ত্রের বনিয়াদ এমনি পাকা।

কাজেই সেকালে অষ্টসিদ্ধি ও কৃষ্ণ ষট্‌কর্ম যে তন্ত্রশাস্ত্রকে আকর্ষণের বস্তু করে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর তন্ত্রের পথ প্রশস্ত, তার বাণী উদার। তার দ্বার অবারিত—বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত সবার জন্যই।

তন্ত্রে বিষ্ণু "প্রাণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ং। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্॥" রামায়ণের শ্রীরাম "রামায় রাম-ভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥" গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ "নমস্তে নরকারাতে নমস্তে মধুসূদন। নমস্তে ললিতাপাঙ্গ নমস্তে নরকান্তক॥" গোপালস্তোত্রে "বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপ নারীভিরাবৃতম্। প্রভিন্নাঞ্জন কালিন্দীজল-কেলিকলোৎসুকম্॥" শিবস্তোত্রে "আদিমধ্যান্তশূন্যায় নিরস্তা-শেষভীতয়ে। যোগিধ্যেয়ায় মহতে নির্গুণায় নমো নমঃ॥" শ্যামা-প্রকরণে "অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাঃ কালিকায়াঃ সুদুর্লভাঃ। যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তা ভবেন্নরাঃ॥"

তন্ত্রশাস্ত্র যে তাই পূর্বাঞ্চলের ধর্মবেদীতে বসে সর্বমতের মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেছে তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই।

সর্বমতই তন্ত্রে স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু এই মাতৃকেন্দ্রিক পূর্বাঞ্চলে স্থায়ী ও দৃঢ় আসন পেতেছে শাক্ততন্ত্র। বিশেষ করে বাঙালীর ধর্মমতে ও আচারে শাক্ততন্ত্রের চরম প্রাধান্য ঘটেছে। বাঙালী ব্রাহ্মণের কাছে তার তান্ত্রিক 'ইষ্টমন্ত্রে'র মাহাত্ম্য ও কদর বৈদিকী 'গায়ত্রী'র চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বেদবিহিত উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের আদিতে এদেশে তান্ত্রিক-দেবী 'ষোড়শ মাতৃকা'র পূজা না করলে চলে না।

এবার দেখা যাক এমন প্রবল শাক্ততান্ত্রিক প্রাধান্যের কারণ কি রয়েছে।

শাক্ততন্ত্রের প্রধান ধারক ও বাহক আদ্যাশক্তি। দুটি রূপে তিনি এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত; এক, চণ্ডী বা দুর্গা; দুই, কালিকা। এ দুজনের মধ্যে দেবী কালিকাই বেশি জনপ্রিয়; কারণ বোধহয় তিনি অপেক্ষাকৃত উগ্রবীর্যা ও সহজপূজ্যা। যথাস্থানে তন্ত্রের দেবদেবীর কথা বলা যাবে, তবে এখানে শুধু এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মনে হয় দেবী কালিকার পূজা এ অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছে দুর্গাপূজার পূর্বে।

দুর্গাপূজাও প্রাচীন সন্দেহ নেই, কারণ একাদশ কি দ্বাদশ শতকের প্রখ্যাত জীমূতবাহন থেকে ষোড়শ শতকের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুনন্দন পর্যন্ত একটানা সকল স্মার্তই এ পূজার উল্লেখ করেছেন।

প্রসিদ্ধ পুঁথি 'কালিকা পুরাণ' যে বাঙলা দেশেই লেখা হয়েছে এ তথ্যের ভিত্তি মোটামুটি দৃঢ় বলেই বলা চলে, আর 'তন্ত্রসার'-প্রণেতা ষোড়শ কি সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যে প্রচলিত কালীমূর্তির রূপ-কল্পনা করেছেন তা সত্য বলে মনে না করার কোনো কারণ নেই।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই উগ্রবীর্যা, শ্মশানচারিণী দেবী কালিকা সিদ্ধিকামী তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর আদর্শ-স্থানীয়। এই সর্বসিদ্ধিদাত্রীকে দশটি মহাবিদ্যার রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এরা যথাক্রমে (১) কালী (২) তারা (৩) ষোড়শী (৪) ভুবনেশ্বরী (৫) ভৈরবী (৬) ছিন্নমস্তা (৭) ধূমাবতী (৮) বগলা (৯) মাতঙ্গী বা মাতঙ্গিনী (১০) কমলা, কারো কারো মতে, ত্রিপুর-সুন্দরী*।

বিশ্বসারতন্ত্রে যে শ্লোকের মধ্যে দিয়ে এঁদের স্মরণ করার সহজ চেষ্টা হয়েছে তা হল—

* অন্তত, উড্রফের ফিরিস্তা থেকে তা-ই মনে হবে। মতান্তরে, ত্রিপুর-সুন্দরী ষোড়শী মূর্তি। কলকাতার দক্ষিণে বিখ্যাত বোড়াল গ্রামে একটি ত্রিপুর-সুন্দরীর মন্দির রয়েছে।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥"

এই দশ-মহাবিদ্যা একই দেবীর বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন মূর্তি, এবং এক-এক প্রকার ইষ্টলাভের জন্য এক-এক মহাবিদ্যার পূজাবিধি। অতএব এঁদের সাধনার পথ বিভিন্ন। সে কথা আমাদের আলোচ্য নয়।

এই দশ-মহাবিদ্যার মধ্যে এ অঞ্চলে প্রাধান্য পেয়েছেন দেবী কালিকা। বহু তান্ত্রিক-সাধক কালী-সাধনায় ব্রহ্মত্বলাভ করেছেন বলে প্রসিদ্ধি রয়েছে, যথা—রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। শক্তিতত্ত্ব বোঝার জন্য প্রথম প্রয়োজন যোগ্য গুরুর কাছে দীক্ষা, তারপর গুরুর সম্মতি অনুসারে অভিষেক, পরে ক্রমে পূর্ণাভিষেক। এ সাধনায় ক্রমদীক্ষাভিষেকের পথে ধাপে ধাপে উঠতে হয় এবং তা শেষ হয় মহাপূর্ণ দীক্ষাভিষেকে বা বিরজা-গ্রহণাভিষেকে। তখন সাধক নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করে পূর্ণাহুতি দান করেন তার উপবীত ও শিখা দিয়ে। তারপর 'সোহং' মন্ত্রে করেন আত্মোপলব্ধি। তন্ত্রশাস্ত্রে সাধকের এ দশাকে বলা হয় জ্ঞানমুক্তি—সাধক তখন হন পরমহংস।

'পরমহংসে'র অর্থ জ্ঞানমুক্ত, নির্বিকার মহাযোগী। এ অবস্থাটা হল তন্ত্র-প্রসিদ্ধ 'কৌল'ধর্মের শেষ ধাপ। 'কৌল'ধর্মের কথা পরে আসবে। পরমহংসের অবস্থা বোঝাতে যে শ্লোকটির ব্যবহার হয় তা এখানে উদ্ধৃত করছি।

"অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে ॥"

অর্থাৎ জ্ঞানমুক্তের কাছে সকল ধর্মমতই সমান। কখনো তিনি শাক্তমত প্রচার করেন, কখনো শৈবমতের প্রশস্তি গান, আবার কখনো বৈষ্ণব মতে 'গোপীজন বল্লভায় স্বাহা' বলেন। কখনো তাঁকে

ভ্রষ্ট ও ভূত-পিশাচের দোসর বলে মনে হয় ; কখনো নিতান্ত শিষ্ট, সভ্য। তাঁর কাছে চন্দন ও বিষ্ঠার প্রভেদ দূর হয়েছে—আর দূর হয়েছে বাড়ি ও শ্মশানের বিভেদ। পুত্র ও শত্রুর প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি।

তন্ত্রে পরমহংস ছাড়াও সমশ্রেণীর আর একটি কথা রয়েছে। সেটি অবধূত। অবধূতের অর্থ* যাঁর ধূত বা 'পাশ' নেই ; অর্থাৎ তিনি পাশমুক্ত, তাই বরেণ্য। তিনি 'অক্ষর' অর্থাৎ ক্ষয় বা বিকার কিছুই নেই। তন্ত্রশাস্ত্রমতে মানুষের জীবনে আশ্রম দুটি ; গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস বা ভিক্ষাচর্যা। বেদবিহিত পথে আশ্রম চারটি : ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। তন্ত্রশাস্ত্রমতে সন্ন্যাসীকে বা মতান্তরে এই ভিক্ষাজীবীকে অবধূত বলা হয়। অনেকের মতে অবধূতদের শ্রেণীবিভাগ রয়েছে।

পরমহংসের কথা বলতে গিয়ে আমরা এখানে 'হংস' শব্দটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। তন্ত্রদীক্ষা সম্পর্কে যাদের কিছু কিছু জ্ঞান রয়েছে তাদের আর এ আলোচনা কেন, তা বুঝিয়ে বলতে হবে না। অন্য সকলের কাছে এটি একটি সাধারণ তথ্যেরই বিবৃতি বলে উপস্থিত করছি।

হংস বা হাঁস লিপ্তপদ জলচর ও স্থলচর অর্থাৎ উভচর পাখি। কবিপ্রসিদ্ধি যে, হাঁস জলমিশ্রিত দুধ থেকে দুধ বেছে নিয়ে তা পান করতে পারে।

এ ছাড়াও হংস শব্দের আরও কয়েকটি অর্থ রয়েছে† ; যথা (১) পরমাত্মা, (২) জীবাত্মা, (৩) সূর্যদেব, (৪) শিব, (৫) সন্ন্যাসীবিশেষ—যেমন পরমহংস, (৬) গুরু ইত্যাদি।

---

* অক্ষরত্বাদ্ বরেণ্যত্বাদ্ ধুতসংসারবন্ধনাৎ।
'তত্ত্বমস্য'র্থ সিদ্ধত্বাদ্ অবধুতোঽভিধীয়তে॥ (ধুত=পরিত্যক্ত)

† হংসো বিহঙ্গভেদে স্যাদর্কে বিষ্ণৌ হয়ান্তরে।
যোগিমন্ত্রাদিভেদেষু পরমাত্মন্মৎসরে।
নির্লোভনৃপতৌ হংসঃ শারীরমরুদন্তরে॥ (—বিশ্বঃ)

তন্ত্রসার পুঁথিতে 'সারদাতিলকে' উল্লিখিত যে যোগপ্রণালীর বিবরণ দেওয়া আছে, তাতে বলা হয়েছে যে কুণ্ডলিনী শক্তি 'হংস' আশ্রয় করে জীবাত্মাকে ধারণ করেছেন। আর 'হংস' রয়েছেন প্রাণকে আশ্রয় করে। হং মন্ত্রে শ্বাস গ্রহণ এবং 'সঃ' মন্ত্রে শ্বাসের বহির্গমন হয় বলিয়া এই নাম।

এ যোগাভ্যাসের ফল কি? এ যোগাভ্যাসে সংসারের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়ে ক্রমে 'হংস'-লক্ষণ বা অব্যয় জ্ঞান প্রকাশ পায়। 'হং' বর্ণটি পুরুষ, সঃ বর্ণটি প্রকৃতি—পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে সঞ্জাত হয়েছে 'হংস'; এই হংসের নামই অজপা। জীব অবিরত এর আরাধনা করে। যখন প্রকৃতি পুরুষকে তার নিত্য আশ্রয় মনে করে একীভাবাপন্ন হয়, তখন 'হংস' হয়ে যায় 'সোঽহং'। তারপর?

"সকারার্ণং হকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃ পরম্।
সন্ধিং কুর্যাৎ পূর্বরূপং তদাসৌ প্রণতো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ তারপর যদি মূর্তিস্বরূপ 'স' কারই লোপ করে দেওয়া হয় তবে সন্ধি করে 'সোহং' পরিণত হয় 'ওঁ'-এ অর্থাৎ প্রণবে। নিরুত্তর তন্ত্রমতে—

" 'স' কারেণ বহির্যাতি 'হং' কারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসেতি পরমম্ মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥"

অর্থাৎ যোগসাধনার অঙ্গ প্রাণায়ামের পূরকে, অর্থাৎ নিঃশ্বাস গ্রহণে 'হং'-কার জপ করতে হয়, আর রেচকে, অর্থাৎ নিঃশ্বাস-বর্জনে, 'স'-কার। হংস পরম মন্ত্র।

এ মহামন্ত্রের নাম কুলার্ণবতন্ত্রের মতে, শ্রীপ্রসাদপরা। ব্রহ্ম-সাধনায় বা পাশমুক্তির শেষপাদে যে পন্থা সাধক আশ্রয় করে তার নাম 'ঊর্দ্ধ-আম্নায়'। শ্রীপ্রসাদপরা-মন্ত্র এ পথে সাধকের পরম বা একমাত্র সহায়। এ মন্ত্রটিও গূঢ়, এর অর্থও গুপ্ত; বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ সবই সর্বত্র প্রকাশ করা যায় কিন্তু 'ঊর্দ্ধ-আম্নায়' বা শ্রীপ্রসাদপরা-মন্ত্রের কথা সর্বথা গোপন রাখতে হয়। এর 'হ্'-কার

শিবের বা পুরুষের দ্যোতক ; 'স' শক্তির বা প্রকৃতির। এই শিব ও শক্তি বা পুরুষ ও প্রকৃতিই বিশ্বপ্রাণের মূলসত্তা—সৃষ্টির প্রাণস্পন্দনকে জীবন্ত ও চলন্ত রেখেছে। এ মন্ত্রের দেবতা বা অধিকর্তা স্বয়ং শিব, ছন্দ গায়ত্রী, আর দেবী হলেন বিশ্বের সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী।

'প্রসাদপরা' শব্দটির অর্থ কি ? প্রসাদ অর্থাৎ এ মন্ত্রে ব্রহ্মের প্রসাদ বা আশীর্বাদলাভ ঘটে ; তার সঙ্গে 'পরা' বা সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ করে মন্ত্রটিকে আরো বিশিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ যে-সব মন্ত্রের সাধনায় ব্রহ্মলাভ ঘটে, তার মধ্যে 'শ্রীপ্রসাদপরা' সর্বশ্রেষ্ঠ।

এতক্ষণ তন্ত্রশাস্ত্রমতে হংস ও যে সোঽহং ও ওঁ এরই প্রতিমূর্তি এ কথা বলা হয়েছে। এবার দেখা যাক উপনিষদ্ এ বিষয়ে কি বলে।

কঠোপনিষদের দ্বিতীয়া বল্লীতে (৮৮।২) 'হংস'কে বলা হয়েছে—

"হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষস-
দ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বর সদৃতসদ্ব্যোম সদব্জা
গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥"

হংসকে এখানে পরমাত্মা ও সূর্য এই দ্বিরূপেই কল্পনা করা হয়েছে বলে মনে হয়। বলা হয়েছে, হন্তি, গচ্ছতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতীতি হংসঃ। হন্তি অর্থ সর্বত্র গমন করে।

উপরে হংসের যে বিশেষণগুলি দেওয়া হয়েছে তাদের অর্থ—

শুচিষৎ	=	স্বর্গরূপ শুচিদেশে অবস্থিত।
বসু	=	সর্বলোকের স্থিতি-সাধক।
অন্তরিক্ষসৎ	=	অন্তরীক্ষে ভ্রাম্যমান।
হোতা	=	অগ্নিস্বরূপ।
বেদিষৎ	=	পৃথিবীরূপ বেদীতে বাস।

অতিথি ও দুরোণসৎ	=	সোমরস রূপ ‘দুরোণে’ বা কলসে থাকেন।
নৃষৎ	=	মানুষের দেহে রয়েছেন।
বরসৎ	=	সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে রয়েছেন।
অব্‌জা	=	জলজ।
গোজা	=	গোরূপা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।
ঋতজা	=	সত্যমূর্তি।
অদ্রিজা	=	জল (নদী) রূপে পর্বতে প্রকাশ পান।

‘হংস’ সত্যস্বরূপ—হংস পরমাত্মা বা নচিকেতার প্রার্থিত সেই পরমজ্ঞান—এই এখানে বক্তব্য।

উপনিষদ্ ও তন্ত্রের চিন্তাসূত্র যে এক এবং তার উদ্ভবও যে একই বীজ থেকে, তা এক্ষেত্রে স্পষ্ট বোঝা যায়।

এবার দেখা যাক আমরা এ অধ্যায়ে তন্ত্র সম্পর্কে কি কি তথ্য পেলাম।

ভারতবর্ষে তন্ত্রপ্রধান অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া গেল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে। এ দেশগুলির আধুনিক নামগুলিও জানা গেল। এর কারণ হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটেছিল এ অঞ্চলে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অন্তিম রূপ বজ্রযান, আর সে রূপে তার প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল সম্ভবত বঙ্গের চন্দ্রদ্বীপে বা আধুনিক বাখরগঞ্জে। বজ্রযানের প্রধান পীঠ চারটি—কামাখ্যা, শ্রীহট্ট, পূর্ণগিরি ও উড্ডীয়ান বা ওদীয়ান।

বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের প্রভেদের কাহিনী আমরা জেনেছি আর তাদের সাধারণ লক্ষণের সাথেও কিছু কিছু পরিচিত হয়েছি। আগম-নিগম ও যামল সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা হয়েছে।

তারপর বলা হয়েছে বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের অষ্টসিদ্ধির কথা।

এই পূর্বাঞ্চলে তার দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করেছে শাক্ততন্ত্র। এ অঞ্চলে শক্তিপূজার প্রাধান্য কেন ঘটল তার মোটামুটি কারণও

আমরা নির্ণয় করেছি। আর জেনেছি শক্তিপূজায় দেবী কালিকাই কেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

এই উগ্রবীর্যা দেবীকে দশ-মহাবিদ্যারূপে কল্পনা করা হয়েছে; এঁরা পূর্বাঞ্চলে সুপরিচিত।

আমরা জেনেছি 'পরমহংস' কাকে বলে, আর জেনেছি 'অবধূতের' কথা। পরমহংসের কথা বলতে গিয়ে তন্ত্রে ও উপনিষদে হংস শব্দের যে গূঢ় ব্যাখ্যা রয়েছে তার সন্ধান পেয়েছি আর এর মধ্য দিয়ে দেখেছি যে তন্ত্র ও উপনিষদ্ এ দুটি একই সূত্রে বাঁধা।

চতুর্থ অধ্যায়

তন্ত্রের মর্মবাণী

এবার আমরা তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় অর্থের সন্ধানে প্রবৃত্ত হব।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল। বৌদ্ধতন্ত্রের অন্তিম রূপ মহাসুখবাদ বা বজ্রযানের বিলয়ের পরে সে তন্ত্রবাদের পড়ো-বাড়িতে ঢোকা নিরর্থক। তারপর হিন্দুরা সে গৃহের রকমারি আসবাবপত্রের বেশ কিছুটাই ইতিমধ্যে নিজেদের গৃহসজ্জায় ব্যবহার করে ফেলেছে। তাই বৌদ্ধতন্ত্রের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা প্রধানতঃ হিন্দুতন্ত্রেরই আলোচনা করব।

হিন্দুতন্ত্রে সর্ব-মতের অপূর্ব সমন্বয়; এ যেন সর্ব আচারের তীর্থক্ষেত্র। বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, শৈব ও শাক্ত সবারই ঠাঁই হয়েছে এ মিলনক্ষেত্রে। তারপর এর সঙ্গে এসে মিশেছে বৌদ্ধাচারের ধারা; এর ফলে তার রমণীয়তা ও আকর্ষণ বেড়েছে প্রচুর। এ-সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা পূর্ব অধ্যায়েও করা হয়েছে।

কিন্তু এ-সব তো গেল তার বাহ্য চাকচিক্যের কথা। তান্ত্রিক ও বৈদিক পন্থার মূলগত প্রভেদ কি? পন্থার মত এদের লক্ষ্যও কি বিভিন্ন? এ-সব প্রশ্নের একদিকে রয়েছে প্রভেদ-গত ঘনারণ্যের স্পষ্ট গোলকধাঁধা, অন্যদিকে দেখা যায় অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা সামঞ্জস্যের জটিল সমস্যা। এদের বিভিন্নতা ও একাত্মতা এই দুয়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমরা তন্ত্রের মর্মবাণীর সন্ধান পাব।

বেদের সারতত্ত্ব রয়েছে উপনিষদের মধ্যে। 'অমৃতত্ব' লাভই বৈদিকী সাধনার মূল লক্ষ্য; এই লক্ষ্যের কথা প্রতিটি উপনিষদেই ঘোষিত হয়েছে। এ অমৃতত্বের অর্থ ব্রহ্মলাভ বা জ্ঞানমুক্তি। অমৃতত্ব স্বর্গসুখও নয়; এই মরদেহকে চিরস্থায়ী করার কল্পনাও নয়। এটি

এমন একটি অবস্থা যাতে মানুষ সর্বপ্রকার দুঃখ, কষ্ট ও পাপের ঊর্ধ্বে নিজেকে তুলে ধরতে পারে—যাতে সে পরম শান্তি ও চির-আনন্দের সন্ধান পায়। তন্ত্রের লক্ষ্যও 'পরমহংসত্ব' লাভ বা জ্ঞানমুক্তি বা পাশমুক্তি। উপনিষদে যার অর্থ অজ্ঞান, তন্ত্রে তাকেই বলা হয়েছে 'পাশ' অর্থাৎ পশু-জীবনের যত-কিছু বন্ধন। লক্ষ্য দুটি পন্থারই এক।

উপনিষদ্ থেকে নয়টি দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হিন্দুর ষড়্দর্শন—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত; আর রয়েছে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন। দ্বিতীয় দলকে নাস্তিক্যবাদী আর প্রথম দলকে আস্তিক্যবাদী বলা হয়।

অনেকের মতে যেমন বেদান্তই আস্তিক্যবাদী দর্শনের সারতত্ত্ব, তেমনি তন্ত্রের সারতত্ত্ব বলা হয় কুলার্ণবতন্ত্রে বর্ণিত শক্তি-সাধনাকে।

তন্ত্র-সাধক মনীষী উড্রফ বলেছেন, এই তন্ত্রশাস্ত্রটিই আগম নামাঙ্কিত শাক্ততন্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও বিপ্লবধর্মী; এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বে চরম সাহসিকতার পরিচয়। এর সর্বতোমুখী সাধনার জগতে রয়েছে তান্ত্রিক সাধনার মূলতত্ত্ব ও তান্ত্রিক দর্শনের মূলসূত্র, আর সে সূত্রজাত নৈতিক ও সামাজিক বিধিবিধানের ইঙ্গিত।

শাক্ততন্ত্র কেন এই পূর্বাঞ্চলে স্থায়ী ও দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করেছে সে সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। এই শাক্ততন্ত্রের মধ্যমণি কুলার্ণবতন্ত্র—কৌলধর্ম বা কৌলসাধকদের সাধনা-পদ্ধতির কথা। এই পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রের অন্দর মহলের চিত্র।

কুলার্ণবতন্ত্রে মোট সতেরটি পরিচ্ছেদ; শ্লোকের সংখ্যা দু-হাজার আটাশ। কিন্তু বিদ্বজ্জন অনুমান করেন যে এটি সমগ্র তন্ত্রটির একটি অংশ মাত্র; সমগ্র তন্ত্রের শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার। বক্ষ্যমাণ পুঁথিটি এটির পঞ্চম খণ্ড মাত্র। তা যা-ই

হোক, কৌলধর্মের দর্শনতত্ত্ব রয়েছে এই খণ্ডেই; তার পরিচয় আমরা ক্রমশ পাব।

পৃথিবীতে মনুষ্য-জন্মই যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা কাম্য এ কথা নানা তন্ত্রে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। বিশ্বসারতন্ত্র বলেছে, দেবতারা ও পিতৃপুরুষেরা এই জন্ম কামনা করে। কারণ অন্য কোনো জন্মে জীব পরিপূর্ণ সত্যের জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। মুক্তির প্রথম ধাপই হল মনুষ্য-জন্ম। কিন্তু এ জন্ম পুণ্যলব্ধ আর সে পুণ্য যাঁরা অর্জন করতে পারেন তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

তন্ত্র-দর্শনের মূলসূত্র উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি; একই বীজে দুটির জন্ম। তন্ত্রও অনাসক্তি বা অসঙ্গকে পাশমুক্তির একমাত্র পথ বলে নির্দেশ করেছে। যেমন বৌদ্ধতন্ত্র তেমনি হিন্দুতন্ত্র—এতে কোনো পার্থক্য নেই। সকল তন্ত্রই সমস্বরে বলেছে, সঙ্গ বা আসক্তিই জগতের যত দুঃখ, কষ্ট, পরিতাপের কারণ; আসক্তি বর্জন না করতে পারলে মুক্তি বা মোক্ষলাভ ঘটবে না।

কৌল-ধর্ম তন্ত্রশাস্ত্রের এই সাধারণ সূত্র অনাসক্তি লাভের জন্য কোন্ নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়েছে? কৌল-ধর্মই বা কাকে বলে?

কৌল বা কুলধর্মে যোগ ও ভোগের অপূর্ব সংমিশ্রণ। উপনিষদ্ বা বৌদ্ধধর্মে ভোগের কোন উল্লেখ নেই; সেখানে শুধু যোগের সাহায্যেই অনাসক্তি লাভের কথা।

কুলার্ণবের মতে, স্বয়ং শিব বেদ ও আগম মন্থন করে এই সারভূত কুলধর্মের সন্ধান পেয়েছেন।

"মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগম মহার্ণবম্।
সারভূতো ময়া দেবি কুলধর্মঃ সমুদ্ধৃতঃ॥"

আর তাঁরই মতে, এ ধর্মটিই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়, কারণ

"যোগভোগাত্মকম্ কৌলং তস্মাৎ সর্ব্বাধিকং প্রিয়ে।"

অর্থাৎ এতে রয়েছে যোগ ও ভোগের বিশ্লেষণ; ভোগের মধ্য দিয়ে যোগের সন্ধান।

কুলধর্মের মুখ্যবাণী বা মূলতত্ত্ব হল :

"যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা।"

অর্থাৎ যে-সকল দ্রব্য বা বস্তু দ্বারা প্রলোভিত বা চালিত হয়ে মানুষ নিরয়গামী হয়, সে-সকল বস্তুকেই অবলম্বন করে কৌল-সাধক সিদ্ধিলাভ করে।

কুলধর্মের এ দাবিটা আমাদের কাছে নিতান্তই একটা বাগাড়ম্বর, অন্তত একটা হেঁয়ালি বলে মনে হবে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, কে না জানে—

"ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥"

কে না জানে যে, কামনা চরিতার্থ করে কখনও কামনার নিবৃত্তি ঘটে না—শুধু কামনাই বেড়ে যায় মাত্র। আগুনে ঘি ঢাললে কি আগুন নিবে যায়? তা শুধু বাড়তেই থাকে।

তারপর অসঙ্গ বা অনাসক্তিই যদি পাশমুক্তির একমাত্র পথ বলে তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত হয়, তবে তার চিরন্তন প্রতিপক্ষ 'সঙ্গ' তো তার চরম শত্রু ; কারণ কামনাই তো সঙ্গজাত।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥"

অর্থাৎ সঙ্গ থেকে হয় কামের বা কামনার জন্ম, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ আর বুদ্ধিনাশ থেকে আসে অপদার্থতা বা পুরুষার্থের অযোগ্যতা। ফলে এই চিরকাম্য মনুষ্যজন্মটি বৃথাই যায়।

তাই 'সঙ্গে'র মধ্যে দিয়ে 'অসঙ্গ' লাভের কথাটাকে একটা বিরাট্ প্রহেলিকা ছাড়া আর কি বলা চলে?

এ সমস্যাটি যে আমাদের কাছে হেঁয়ালি বা প্রহেলিকা বলে

মনে হয় তার কারণ আমাদের জন্মগত সংস্কার—যে সংস্কার রয়েছে আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে।

কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক।

আমরা চিরদিনই শুনে এসেছি এবং এখনো শুনছি যে. সংসারে বাস করে পত্নী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত হয়ে কখনো আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করা যায় না, আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ ঘটে না। গার্হস্থ্যের পরে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস; শেষের দুটি আশ্রমই মাত্র আধ্যাত্মিক জীবনের সহায়ক। গার্হস্থ্য জীবন চিরাগত চিন্তাসূত্রে বন্ধনের নামান্তর মাত্র। আমাদের চিরন্তন ধারণা যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছাড়া কেউ আর দিব্যজীবন লাভ করতে পারে না। আর, প্রতিটি সন্ন্যাসীই যে-কোনো গৃহস্থের চেয়ে পবিত্রতর জীবন যাপন করে। সংস্কারগতভাবেই আমরা গেরুয়াধারীর পায়ে মাথা নোয়াই—গেরুয়াধারীদের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি।

শ্রুতি শ্রেয়কে লাভ করার পথ নির্দেশ করেছে প্রেয়কে দূরে ঠেলে দিয়ে; স্বভাবত বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিগুলিকে অন্তর্মুখী করতে বলেছে অভ্যাস, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের দ্বারা। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে যোগাভ্যাস করতে বলেছে। এগুলি কি এতই সহজ, না সাধারণ্য বা সাধারণের ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে? যদি ভগবান্ বুদ্ধ কল্পনা করে থাকেন যে দেশজোড়া মানুষ নির্বাণলাভের জন্য সংসার ত্যাগ করে বিহারবাসী ভিক্ষু ভিক্ষুণীতে পরিণত হবে, তবে সে কল্পনার মধ্যে কতটুকু বিচার-বুদ্ধির স্থান ছিল? মহাবীর কি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে দিগম্বর তীর্থঙ্করে দেশ ভরে যাবে?

যা অসাধারণ বা যা মানুষের স্বভাবজ সহজ বৃত্তি নয় তা কখনো সাধারণ্য বা সর্বসাধারণের ধর্ম হতে পারে না। তাই শ্রেয়, পুরুষার্থ, মুক্তি বা নির্বাণপথের যাত্রী সংখ্যায় নিতান্তই মুষ্টিমেয়।

তন্ত্রশাস্ত্র বাস্তববাদী; এই বস্তুতন্ত্রকে মেনে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তান্ত্রিক সাধনার বিধি রচিত হয়েছে। এ বিধির মুখ্যকথা,

'ভোগো যোগায়তে'* অর্থাৎ ভোগকে অতিক্রম করে ভোগবর্জিত যোগের মধ্যে যেতে হবে—ভোগকে এড়িয়ে নয়, আস্বাদ করে। তান্ত্রিক ধর্মে ভোগ যৌগিক সাধনারই মতো মুক্তিপ্রদ, অবশ্য যদি সাধক অনাসক্ত হন। এই সহজ কথা কেন অনেকে বুঝতে চান না বলা কঠিন। গার্হস্থ্যজীবন পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে 'বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস'জীবন যাপনের কল্পনায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরাও 'ভোগো যোগায়তে' শুনে আঁতকে ওঠেন। একে সংস্কার ছাড়া আর কি বলা চলে ?

সাধারণজনের কাছে এই বাস্তব সংসার কি কখনো অর্থহীন বলে মনে হতে পারে? তা পারে না। জন্মের পূর্বে মানুষের ইতিহাস যেমন অব্যক্ত ও অগম্য, মৃত্যুর পরবর্তী কথাও তেমনি। কিন্তু তাই বলে এই জীবিতকালের এই নানা অভিজ্ঞতা ও আস্বাদকে কে অস্বীকার করতে পারে? ক্ষণিক বলেই তা মূল্যহীন বা অশ্রদ্ধেয় নয়। পিতামাতার সন্তানস্নেহ, পতিপত্নীর প্রেম-বন্ধন, সন্তানের শ্রদ্ধা, বন্ধুবান্ধবের ও আত্মীয়স্বজনের প্রীতি ও শুভেচ্ছার কি কোন মূল্য নেই? এ-সব নিয়েই তো মানুষের সামগ্রিক জীবন, এগুলি বাদ দিলে সে জীবনের কতটুকু আর অবশিষ্ট থাকে ?

উপনিষদের শ্রেয়োবাদ মানুষের এই সামগ্রিক জীবনকে অস্বীকার করেনি বটে, কিন্তু তাকে যথাযোগ্য স্থানও দেয়নি। তন্ত্রপন্থা পরিপূর্ণভাবে এই জীবনকে স্বীকার করেছে; দৈনন্দিন বাস্তব-জীবনের মধ্যে শিব ও শক্তির, পুরুষ ও প্রকৃতির, প্রাণ-স্পন্দনের স্পর্শ অনুভব করতে চেয়েছে, আর সেই স্পন্দনের বীর্যবত্তাকে সম্বল করে দিব্যজীবন লাভের পথকে সহজ করে তুলতে চেয়েছে। শ্রেয়োপথ ও তন্ত্রনির্দিষ্ট পথের ছাড়াছাড়ি হয়েছে এই

* "ভোগো যোগায়তে সাক্ষাদ্ দুষ্কৃতিঃ সুকৃতায়তে
মোক্ষায়তে হি সংসারঃ কুলধর্মে মহেশ্বরি ॥"

সূত্রেই, আর, মানুষের এই সামগ্রিক সত্তার স্বীকারের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তন্ত্রের মর্মবাণী।

'ভোগো যোগায়তে' শুনে আঁতকে ওঠার কি কারণ থাকতে পারে, একমাত্র সংস্কার ছাড়া? একটা সাধারণ উপমার কথা বলা যাচ্ছে। বসন্ত ও কলেরা রোগ থেকে বাঁচতে হলে, হয় চাই রোগের সর্বপ্রকার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা; নয়, রোগের প্রতিষেধক বীজ প্রয়োগ অর্থাৎ টিকা গ্রহণ। দুইয়ের লক্ষ্যই এক—রোগ থেকে অব্যাহতি। শ্রেয়োবাদের কথা মনে হলে কল্পনা করা চলে এ যেন ছোঁয়াচ বাচিয়ে চলার মতো। কিন্তু সে পথও যে সুগম তা নয়। শ্রুতিই বলেছে:

> "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
> দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

তন্ত্রবাদের পথ—প্রতিষেধকের বীজ দিয়ে রোগবীজকে রোধ করা। এ পথও সুগম নয় এবং এ পথে চলতে পারে শুধু তাঁরাই যারা কুলধর্মসিদ্ধ। অন্যের পক্ষে এ পথ

> "কৃপাণধারাগমনাদ্ ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
> ভুজঙ্গ ধারণান্নূনমশক্যং কুলবর্ত্তনম্॥"

অর্থাৎ এ পথে হাঁটা-চলা তীক্ষ্ণধার তলোয়ারের ওপর দিয়ে হাঁটার চেয়েও বিপদ-সংকুল, যেমন বিপদজ্জনক বাঘের গলা জড়িয়ে ধরা বা বিষধরের ফণা মুঠোয় রাখা।

যাঁরা কুলধর্মসিদ্ধ তাঁরা পরমহংস। এই পরমহংসত্ব লাভের পথই কুলধর্মের পথ। এখন সে কথাই বলছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা কুলার্ণবতন্ত্রে বর্ণিত পাশমুক্তির সাতটি পথের কথা বলেছি। এ পথগুলিকে একই পথের বিভিন্ন ধাপ বলা অধিকতর সঙ্গত। এ ধাপগুলি যথাক্রমে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও পরমজ্ঞান; দক্ষিণাচারকে পরমজ্ঞান বলা চলে। দক্ষিণাচারের পরে আরো তিনটি 'আচার' বা সাধন-রীতি রয়েছে: বামাচার বা

বীরাচার, কৌলাচার বা দিব্যাচার এবং সিদ্ধান্তাচার। দিব্যাচারে দিব্যজীবন লাভ ঘটে।

তন্ত্রশাস্ত্রের মতে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানপন্থী মানুষ অর্থাৎ বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী ও শৈবাচারী সবাই পশুশ্রেণীর অর্থাৎ পাশবদ্ধ। শ্রেয়োবাদের মত তন্ত্রবাদের মতেও মানুষের মানসিক জগতের কাঠামো সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সমবায়ে জাত। পশু-স্বভাব মানুষের কাঠামোতে বিন্দুমাত্র সত্ত্বগুণ নেই—রয়েছে রজ ও তম—তমোগুণেরই আধিক্য। দক্ষিণাচারী, বামাচারী ও সিদ্ধান্তাচারীর শ্রেণীর বীর-স্বভাব। বীর-স্বভাবে শুধু রজঃ আর সত্ত্ব গুণ। এর ধাপে ধাপে রজঃ কমে, সত্ত্ব বাড়ে। দিব্যাচারী দিব্যভাবী—তাঁর কাঠামোতে সবই সত্ত্ব, হয়ত রজোগুণের ছিটে-ফোঁটা রয়েছে। প্রকৃত সাত্ত্বিক মানুষের লক্ষণ কি? সাত্ত্বিক মানুষের না থাকে আসক্তি, না থাকে ভয়, না থাকে বিরক্তি।

কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও এদের সংশ্লেষণ (Synthesis) দক্ষিণাচার পর্যন্ত শ্রেয়োবাদ ও তন্ত্রবাদের পথ একই। দক্ষিণাচারের সঙ্গে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সংশ্লেষণের তুলনা করা চলে। এক হিসাবে শ্রেয়োবাদের পথের সীমারেখা এখানেই টানা যেতে পারে। কিন্তু তন্ত্রবাদের পথ সে সীমাকে অতিক্রম করে আরো তিনটি ধাপ এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে দিব্যভাবের জগতে। এ তিনটি ধাপের মধ্যে রয়েছে সাধকের চরম পরীক্ষার কথা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সাধক যে সত্যি দিব্যলোকবাসী তা প্রমাণিত হবে। শ্রেয়োবাদের মধ্যে এ পরীক্ষার স্থান নেই।

দক্ষিণাচার পর্যন্ত তন্ত্রের পথকে বলা হয় 'প্রবৃত্তিমার্গ', কারণ এ পথে সাধকেরা যাঁর যাঁর স্বভাবজ প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করে সাধনা করেন। কিন্তু বামাচার থেকে সে পথের নাম বদলে যায়। তখন থেকে তার নাম হয় 'নিবৃত্তিমার্গ', কারণ এখানে এসে শুরু হয় সাধকের স্বভাবজ প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ। দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্ত শব্দের

মত তারা একে অন্যের বিপরীতগামী—অন্তরের দিক থেকে। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের মতই বামাচারী বা কৌলধর্মের সাধক সুদুর্লভ।

এই প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। এটা প্রবৃত্তিকে রোধ করে, খর্ব করে; তার গতি বা বেগের অদলবদল করা নয়। তবে তা কি? তা হল প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করা। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে তার মধ্যে এমন একটা বিপরীত শক্তির সৃষ্টি হয় যে-শক্তি প্রবৃত্তির বিলয় ঘটিয়ে দেবে। স্বভাবতঃ মানুষের কামনা নীচগামী; সে কামনাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে তা একটা ঊর্ধ্বগামী শক্তিতে পরিণত হয়ে সাধকের সাধনায় সাহায্য করতে পারে। কি করে তা সম্ভব হয়? এ প্রশ্নের জবাব দেবেন সাধকের গুরুদেব। সাধারণজনের পক্ষে এ প্রশ্ন তোলা অর্থহীন, কারণ বামাচারের পথ জনসাধারণের পথের অনেক ঊর্ধ্বে। তবে প্রবৃত্তির এহেন নিয়ন্ত্রণ দুঃসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

কিন্তু সে কথা থাক।

বামচারে শুরু হয় 'লতাসাধনা' অর্থাৎ সাধকের স্ত্রীশক্তি নিয়ে সাধনা। এই বামাচারের পথকে উদ্দেশ করেই হয়ত ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত এবং আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত বামদেব্যা উপাসনার কথা বলা হয়েছে। এই কঠোর সাধনার অঙ্গ হিসাবে 'পঞ্চ ম-কার' সাধনার* রূপবিকৃতি যে কলঙ্কময় কালিমায় তন্ত্রবাদকে সভ্যজগতে ম্লান ও ঘৃণ্য করে রেখেছে সে কথা যথাস্থানে বলা যাবে।

বামাচারের পরবর্তী ধাপ সিদ্ধান্তাচার, আর তারই রকমফের

* বস্তুতঃ পঞ্চ ম-কার নিয়েই দক্ষিণাচার ও বামাচারের পার্থক্য করা হয়েছে :

"পঞ্চমুদ্রাদিসংযুক্তো বামাচারঃ প্রকীর্তিতঃ।
পঞ্চমুদ্রাদিরহিতো দক্ষিণাচার-সংজ্ঞকঃ॥ —বিশ্বসারতন্ত্র

অঘোরাচার ও যোগাচার। এ পথের শেষ ধাপ কৌলাচার যাতে শিবত্ব বা পরমহংসত্ব লাভ ঘটে। সাধক হন সশরীরে জ্ঞানমুক্ত। কুলার্ণবতন্ত্রের মতে হস্তিপদচিহ্ন যেমন সকল জন্তুর পদচিহ্নকে ঢেকে দেয়, তেমনি কুলধর্ম সকল ধর্মবাদকে পুরোপুরি আবৃত করে রাখে। সকল দর্শন-স্রোত এসে একীভূত হয়েছে এই কুলধর্ম-সাগরে।

যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে কেউ বামচারের পথে পা বাড়াতে পারে না। তারপর এর ধাপের পর ধাপ পার হতে চাই যথাযথ ছাড়পত্র। এ পরীক্ষাও নেন সাধকের গুরুদেব আর ছাড়পত্রও দেন তিনিই। বলা বাহুল্য, একমাত্র জ্ঞানমুক্ত গুরুদেব ছাড়া এ কাজ আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কুলার্ণবতন্ত্রে এরূপ জ্ঞানমুক্ত গুরুর কথা যা রয়েছে তা পরে বলা যাবে।

এই কুলধর্মের তাৎপর্য বা মর্ম কি নির্বিচারে সবাইকে বলা চলে ? না, তা চলে না। এ মর্মবোধের জন্য চাই সাধকের যোগ্যতা, চাই তাঁর আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি। তাঁর যোগ্যতা-সম্পর্কে কুলার্ণবে যা বলা হয়েছে তাই এখন বলছি। এই যোগ্যতার মান তিনটি :

ক. বলা বাহুল্য, তন্ত্রবাদ পূর্বজন্ম ও পরজন্মে, অর্থাৎ জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাসী। এ স্থলে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, পূর্বজন্মার্জিত জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা সাধকের মানস-জগৎ ও প্রকৃতি এত উন্নত হয়েছে কি না যাতে তিনি এখন কৌলধর্ম-মাহাত্ম্য পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারেন। অর্থাৎ গুরুর প্রথম বিচার্য যে, এ জন্মে বোধি বা পরমজ্ঞান সাধকের বোধগম্য হবে কি না।

খ. মন্ত্রজপ অন্তর্যাগের নামান্তর। এর একটি ফল আত্মশুদ্ধি, অন্যটি পরম চেতনার বোধন ও সংসিদ্ধি বা স্বভাবসিদ্ধত্ব লাভ। কুলধর্মের সাধকের পক্ষে মন্ত্রজপের এ দুটি ফলের একটা বিশিষ্ট মান থাকা প্রয়োজন। তাই গুরুর দ্বিতীয় বিচার্য যে, অন্তর্যাগের ফলে সাধক যথাযোগ্য শক্তিলাভ করতে পেরেছেন কি না।

গ. তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি চর্যার বিধিমত অনুসরণে

একদিকে অজ্ঞান আর অন্য দিকে অহমিকা ক্রমশ দূর হতে থাকে। সাধনার পথে অজ্ঞান ও অহমিকা দুই-ই পরম শত্রু। তাই সাধকের মন থেকে এ দুটি শত্রুর প্রভাব আশানুরূপ দূর হয়েছে কি না তাই হল গুরুর তৃতীয় বিচার্য বস্তু।

তারপর বিবেচ্য, সাধকের মনে তাঁর গুরু ও তাঁর আরাধ্য দেবদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি ও আস্থা রয়েছে কি না এবং সর্বোপরি এমন স্থিরবিশ্বাস রয়েছে কি না যে পরমাত্মার আশীর্বাদ তাঁর মাথায় বর্ষিত হবেই হবে।

এ-সব বিচারের ফলে যদি তিনি যোগ্য সাধক বলে বিবেচিত হন তবেই গুরু তাঁকে বামাচারের সাধনায় দীক্ষা দেবেন। তাই মহাজ্ঞানী ও মহাযোগী ছাড়া এই পরীক্ষামূলক ও পরম বিপৎসংকুল পথে পা বাড়ানো শাস্ত্রবিরোধী কর্ম।

কুলার্ণবতন্ত্রে কুলধর্মকে বেদোক্ত ধর্ম বলে বলা হয়েছে। "বেদাত্মকম্ শাস্ত্রং বিদ্ধি কৌলাত্মকম্"। শিবত্বপ্রাপ্তি কুলসিদ্ধ সাধকের লক্ষ্য। কুলধর্মের আরাধ্য দেবতা শিবের পঞ্চমুখ বলে কল্পনা করা হয়েছে। পঞ্চানন তাঁর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও ঊর্ধ্ব—এই পঞ্চমুখে সিদ্ধিমন্ত্র দান করছেন—এ-সব মন্ত্রের সংজ্ঞা 'আম্নায়'। কোন্ কোন্ মুখে কি কি 'আম্নায়' উচ্চারিত হচ্ছে ?

ক. পূর্ব-আম্নায়—এ আম্নায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব ও মন্ত্রযোগের কথা।

খ. দক্ষিণ-আম্নায়—স্থিতিতত্ত্ব ; ভক্তিপথের পাথেয়।

গ. পশ্চিম-আম্নায়—প্রলয় বা সংহারতত্ত্ব ; কর্মপন্থার সহায়।

ঘ. উত্তর-আম্নায়—আরাধ্য দেবতার অভয়বাণী ও আশীর্বাদতত্ত্ব ; জ্ঞানপন্থার সম্বল।

ঙ. ঊর্ধ্ব-আম্নায়—পূর্ণ ব্রহ্মত্বলাভের গূঢ়মন্ত্র শ্রীপ্রসাদপরা। এ সম্বন্ধে বিশদভাবে বলা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

এবার আমরা বামাচারী সাধকের পক্ষে যোগ্য-গুরুর কথা বলছি। এই গুরুর আসনে যিনি বসবেন তাঁকে পরমহংস বা

জীবন্মুক্ত হতেই হবে; তেমন শক্তিধর জীবাত্মা না হলে কে আর এই তন্ত্র-সাধনার সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক পথে সহায়ক হবে?

কুলার্ণবতন্ত্র এই জ্ঞানমুক্ত গুরুকুলকে তিনভাগে বিভক্ত করেছে। এঁরা যথাক্রমে—

১. দিব্যৌঘ অথবা দ্যুলোকবাসী দেবতা; যথা, সদাশিব, শক্তি ইত্যাদি। কুলাবর্ণবতন্ত্রের মতে এঁরা সংখ্যায় দ্বাদশ জন।

২. সিদ্ধৌঘ অথবা তপঃসিদ্ধ মহাযোগী যাঁরা সর্বথা পরোৎকর্ষ লাভ করেছেন; যথা, সনক, সনৎকুমার, বামদেব, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি। এঁরা সংখ্যায় একাদশ জন।

৩. মানবৌঘ অথবা ভূলোকবাসী দিব্যজ্ঞানী মনুজশ্রেণী; যথা, নরসিংহ, ভাস্কর, মাধব, বিষ্ণু প্রভৃতি। এঁরা সংখ্যায় ছয় জন।

গুরুকুল সম্পর্কে নানা তন্ত্রের নানা অভিমত। সংখ্যা ও বিভাগ সম্পর্কেও এদের মতদ্বৈধ রয়েছে।

গুরু শব্দের অর্থ নিয়েও তর্কবিতর্ক অনেক। কারো কারো মতে 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার বা অজ্ঞান; 'র'-অর্থে পাপনাশক; 'উ'-অর্থে শম্ভু, অর্থাৎ যিনি উপদেশের দ্বারা সাধকের অজ্ঞান-অন্ধকার ও পাপ বিনাশ করে স্বয়ং শম্ভুরূপে আত্মাকে দর্শন করান, তিনিই গুরু। এ দেশে বহুপ্রচলিত যে গুরুপ্রণাম তার মন্ত্র হল:

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গুরুদীক্ষা তন্ত্রসাধনার প্রথম ধাপ। দীক্ষা-পদ্ধতির কথা পরে বলা যাবে। গুরু সাধকের শক্তি বিচার করে সিদ্ধিলাভের যে পথটি ঠিক করে দেন, তাই তাঁর পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ; সে পথ-নির্দেশ করে গুরু তাঁকে সে পথযাত্রার জন্য যথাযোগ্য উপদেশও দেন। এ পথের সংখ্যা, কুলার্ণবতন্ত্রের মতে তিনটি: কর্ম, ধর্ম ও জ্ঞান।

এ তিনটি পথে মোক্ষলাভের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে তন্ত্র যে উপমা দিয়েছে এখানে তারই উল্লেখ করছি।

ক. কর্ম—কর্মপন্থায় মোক্ষলাভ বহু সময়-সাপেক্ষ। পিঁপড়ে যেমন বহুকাল চেষ্টার ফলে গাছের ডালপালা বেয়ে বেয়ে গিয়ে মগডালে ওঠে ফলের রস গ্রহণ করতে পারে, এ যেন তা-ই। এতে লাগে বহু জীবনের সাধনা।

খ. ধর্ম—এ পথে সাধক কতকটা শাখামৃগ বা বানরের সঙ্গে তুলনীয়। বানর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ফলের লোভে ওঠে মগডালে; তেমনি সাধকও ধাপে ধাপে যান তাঁর লক্ষ্যে।

গ. জ্ঞান—এ পথে সাধক পাখির সঙ্গে তুলনীয়। ফলের খোঁজে পাখিরা সোজা উড়ে গিয়ে বসে মগডালে; তারা এদিক-ওদিক যায় না; তাদের নিশানা ঠিক থাকে। সাধকও এ পথে সোজা যান তাঁর লক্ষ্যে—তাঁকে ঘুরতে হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা ধ্যানের স্বরূপ ও প্রকারভেদের কথা বলেছি। ধ্যান যোগের একটি প্রধান অঙ্গ। এখন দেখা যাক যোগ বলতে তন্ত্র কি বোঝাতে চায়।

অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন এ দুটি ধারাকে অবলম্বন করে চলে মানুষের জীবনযাত্রা। তার অন্তর্জীবনে শিবত্বলাভের জন্য চলে একটা স্বাভাবিক স্পন্দন; তারই প্রতিকৃতি ফুটে ওঠে বহির্জীবনে যখন সে জীবন থাকে স্থির, অবিচলিত। কিন্তু নানা সংঘাতের ফলে বহির্জীবন অন্তর্জীবনের সঙ্গে সমতালে চলে এই স্বাভাবিক স্পন্দনকে অব্যাহত রাখতে পারে না। যোগ অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের যোগসূত্র রচনা করে মানুষের এই স্বাভাবিক বৃত্তিকে ক্রমশ স্ফুটতর করে তোলে, তার দৈনন্দিন নানা কর্মকে রূপায়িত ও লীলায়িত করে ও অন্তরে শিবত্বলাভের সহায়ক করে গঠন করে। অন্তরের শিবের সঙ্গে বাইরের শক্তির সংযোগ সাধন করে। তাই,

একে বলা হয় যোগ। শিব ও শক্তির সংযোগ ও একাত্মতা-বোধের নামই যোগ।

তন্ত্রবাদের যোগশাস্ত্র পতঞ্জলির যোগসূত্রেরই অনুগামী, রাজ-যোগও হঠযোগের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। হঠযোগে বর্ণিত দেহশুদ্ধির কথা যোগের বিশিষ্ট অঙ্গ, কারণ এতে মনঃশুদ্ধি ঘটে আর মনের একাগ্রতা বেড়ে যায়।

তন্ত্র রাজযোগ ও হঠযোগের সীমারেখাকে অতিক্রম করে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। আমরা তন্ত্রবাদের যোগশাস্ত্রকে পাতঞ্জলের অনুগামী বলেছি বটে, কিন্তু কারো কারো মতে এ কথা সত্য নয়। হয়ত তন্ত্রের দুয়ার থেকেই এটা পতঞ্জলির কুড়ানো সম্পত্তি ; কথাটা যথার্থও হতে পারে। অবশ্য এ সম্পর্কে বাদানুবাদে আমাদের প্রয়োজন নেই।

তবে এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি অনুসরণ করলে মনের শক্তি বিকশিত হয়ে এমন একটা মানসিক ঋদ্ধির সৃষ্টি হয় যে তাকে মানুষ অলৌকিক বলে আখ্যা দিতে দ্বিধা করে না। এই অপার মানসিক শক্তি কোনো আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি রচনা করে কি না তা নিয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে বটে, কিন্তু এ তত্ত্বটুকুও নিয়ে মতভেদ হবার কথা নয় যে, বিশ্বের মানব-সমাজে অতিমানুষের জন্মের কল্পনায় তন্ত্রসাধনার এই শক্তি-বিকাশের কথার একটা বিশেষ মুল্য রয়েছে।

এর আগে ধ্যানের কথা বলা হয়েছে ; তার সঙ্গে সঙ্গেই আসে মন্ত্রজপের কথা। এরা দুটি সমপ্রাণ সহযোগী। এদের ফলশ্রুতি একই। ধ্যানে পরিশ্রান্ত হলে করতে হয় জপ, আবার জপে পরিশ্রান্ত হলে নিতে হয় ধ্যানের শরণ। দুয়ে মিলে মন্ত্রশক্তির পূর্ণবিকাশ হয়। মন্ত্রজপের একটা সুস্পষ্ট নিয়মবিধি রয়েছে। তা যথাযথ পালন করলেই সিদ্ধিলাভের পথ সুগম হয়।

সাধনার পথে সাধকের পক্ষে তাঁর গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি ও

আস্থা যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তাঁর আরাধ্য দেবতার পদতলে নিশ্চিত শরণ-লাভ। আমরা গুরুর কথা বলেছি, বলিনি আরাধ্য দেবতার কথা। এখন তাই বলছি।

অভীষ্টলাভের জন্য নানা উপচারে দেবতার আরাধনা বা অর্চনা করার নির্দেশ রয়েছে তন্ত্রে। এর নাম পূজা। পূজার অর্থ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কুলার্ণবতন্ত্রের মতে, পূজায় পূর্বজন্মের কর্মফল ক্ষয় পায়, জন্ম-মৃত্যুচক্রের গতি স্তিমিত বা রুদ্ধ হয়, আর পূজকের অভীষ্টলাভ ঘটে।

বিভিন্ন দেবতার পূজায় ব্যবহৃত হয় ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র ও যন্ত্র। মন্ত্রের সাধারণ অর্থ দেবতার কাছে তাঁর প্রশস্তিমূলক স্তোত্রপাঠ ও প্রার্থনা। কিন্তু যন্ত্র কি? তন্ত্রশাস্ত্র মতে যন্ত্র দেবতার অধিষ্ঠান-চক্র অর্থাৎ আসনের রেখাঙ্কন। সকল দেবতারই যথাযোগ্য নিজ নিজ আসন রয়েছে; সে-সে আসনে বসতে পারলে তাঁরা সবচেয়ে বেশি খুশি হন। কাজেই যন্ত্রের ব্যবহার পূজায় অপরিহার্য। কিন্তু এই অধিষ্ঠান-চক্র বা আসনকে যন্ত্র বলা হয় কেন? যন্ত্র বলা হয় এজন্য যে, দেবতার প্রতীকস্বরূপ এই রেখাঙ্কন দিয়ে মানুষের যত দুঃখ ও সন্তাপকে দমন করা বা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। কিসের সে দুঃখ ও সন্তাপ? তন্ত্র বলেছে, যে-সব দুঃখকষ্ট মানুষের আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ বা মানসিক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে জন্মে। নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে বলেই একে যন্ত্র নাম দেওয়া হয়েছে।

যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আসে মণ্ডলের কথা। মণ্ডলও যন্ত্র বটে। তবে মণ্ডলে ও যন্ত্রে প্রভেদ কি? সব যন্ত্রই মণ্ডল আর বিভিন্ন যন্ত্র তারই অংশ-বিশেষ। অর্থাৎ মণ্ডল হল genus বা গণ, আর তার species বা প্রজাতি হল যন্ত্র। মণ্ডল যে-কোনো দেবতার অধিষ্ঠান-চক্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, যদিও সে আসন তাঁর যথাযথ আসন নয় অর্থাৎ সে আসন তাঁকে সর্বাপেক্ষা বেশি আনন্দ দান করে না। সাধারণত মণ্ডল আঁকা হয় নানারূপ রং ব্যবহার করে।

যোগিনীতন্ত্রের মতে দেবীপূজায় তিনটি প্রতীকের যে-কোনো একটির ব্যবহার চলে ; সে তিনটি প্রতীক হল, প্রতিমা, মণ্ডল ও যন্ত্র।

মন্ত্র ও যন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করবেন সাধকের গুরু। আমরা তাই সে কথা ছেড়ে দিয়ে পূজার অন্তর্নিহিত ভাবের কথাই বলছি।

আবার বামাচারের কথায়-ই ফিরে আসতে হল। বামাচারই বীরসাধকের পথ—সে পথ শেষ হয়েছে দিব্যধামে যেখানে বাস করেন জীবন্মুক্তের দল।

নানা সূত্রে সাধারণজনের ধারণা যে তন্ত্রসাধনায় মুখ্য উদ্দেশ্য অষ্টসিদ্ধি ও কৃষ্ণষট্‌কর্ম-সাধনের শক্তিলাভ। এর প্রধান কারণ তন্ত্রসাধনা ও শক্তিসাধনা সমার্থক। তাই এ-সব বিভূতি বা যোগলব্ধ ঐশ্বর্যকে শক্তির চরম প্রতীক বলে গ্রহণ করার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। কিন্তু বীর সাধকের কাছে এ-সব বিভূতির কোনো মূল্য নেই ; এত অল্পে তাঁদের মন ভরে না, তাঁরা চান ভূমার স্পর্শ—পরমহংসত্ব।

বেদাচারী থেকে দক্ষিণাচারী পর্যন্ত বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সাধনায় বিশেষ কোনো তারতম্য নেই। এ পর্যন্ত দ্বৈতভাবেরই সাধনা অর্থাৎ জীব ও শিবের মধ্যে ভেদজ্ঞান বর্তমান। এ-সব ধাপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অর্থাৎ মানুষ ও পরমেশ্বর এই দুয়ে বিভেদ রয়েছে, আর সে বিভেদের ক্রমবিলোপের সাধনাই চলে এ-সব স্তরে। তাই দক্ষিণাচারীর ও বেদান্তপন্থীর শেষকথা হল 'সোঽহং' বা 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম, বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো ভেদ নেই। অর্থাৎ সেই প্রাথমিক দ্বৈতসাধনার পরিসমাপ্তি হয় অদ্বৈতভাবে। অর্থাৎ 'আমি-ই (অহন্তা) এই (ইদন্তা), এই জগৎ,'—এই জ্ঞানে।

বৈদিকী সাধনার শেষ কথা এই 'সোঽহং'।

আর বীরাচারী তান্ত্রিকের সাধনা শুরু হয় এই মন্ত্রে।

গন্ধর্বতন্ত্র বলেছে, 'শিবো ভূত্বা শিবং যজতে' ; 'দেবী ভূত্বা তু তাং যজতে।' অর্থাৎ সাধক নিজেকে শিবরূপে কল্পনা করে শিবের পূজা

করবে; নিজের মধ্যে দেবীত্ব আরোপ করে দেবী বা শক্তিপূজা করবে। তবেই সে পূজা হবে সত্যিকার পূজা, সার্থক।

বীরাচারী বা বামাচারীর তান্ত্রিক পূজার এটিই হল প্রথম ও প্রধান কথা। এই ভাবনা বা শুদ্ধসত্ত্ব ধ্যানের দ্বারাই চলে অন্তর্যাগ, যা ধাপে ধাপে মনুষ্যত্বকে পরিণত করে তোলে দেবত্বে।

কুলার্ণবতন্ত্রও বলে, 'দেবতাভাবম্ আস্থিতঃ' বা পূজায় পূজক নিজেকে দেবতারূপেই কল্পনা করবে; সাধক ও আরাধ্য দেবতার মধ্যে যে কোনো বিভেদ রয়েছে তার চিন্তা যেন মনে না থাকে।

অদ্বৈতবাদের প্রশস্তি পেয়ে তাই কুলার্ণবতন্ত্র বলেছে :

"ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্যাদাত্মচিন্তনম্।
স সর্ব্বং পাতকং হন্যাত্তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥"

অর্থাৎ যিনি ক্ষণতরেও 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' স্মরণ করতে পারেন, নিজের মধ্যে নিমেষের তরেও ব্রহ্মশক্তি অনুভব করেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতা মুহূর্তের জন্যও মনন করতে পারেন, তার সর্ব পাপ দূর হয়ে যায়—যেমন করে দূর হয় সূর্যোদয়ে অন্ধকার।

বিশ্বসার তন্ত্রে বর্ণিত মানব-জন্মের প্রশস্তি গেয়েছে কুলার্ণব তার নিজস্ব ভাষায় :

"দেহো দেবালয়ো দেবি জীবো দেবঃ সদাশিবঃ"

এ দেহটাই দেবালয় বা মন্দির, এখানেই দেব সদাশিব বা শিবশম্ভুর অধিষ্ঠান। কর্মের আবরণেই শিব জীবত্ব পায়, আবার সর্বকর্মের পরিসমাপ্তির মধ্যেই, অর্থাৎ জ্ঞানের মধ্যেই জীব তার শিবত্ব লাভ করে। পাশবদ্ধ শিবই জীব আর পাশমুক্ত জীবই শিব।

এই দিব্য সাধনার পথযাত্রী সাধকদের বীর বলা হয় কেন?

এর কারণ এঁরা বীত বা অতীতকে চিরতরে মুছে ফেলেছেন, এঁরা ক্রোধ, আসক্তি, মোহ, দুঃখ, হিংসার অতীত আর কাতরতা বা ক্লৈব্য এঁদের স্পর্শও করতে পারে না। এঁরা শুধু সত্ত্বগুণান্বিত—এদের মধ্যে রজ ও তমের ছিটেফোঁটাও নেই।

তন্ত্রশাস্ত্রে কুল শব্দের অর্থ শক্তি আর অকুল বলতে শিবকে বোঝা যায়।* যাঁরা কুল ও অকুল উভয়ের সাধনায় জ্ঞানলাভ করেছেন তাঁরাই কৌলিক।

এবার হিসাব করে দেখা যাক তন্ত্রের মর্মবাণী খুঁজতে গিয়ে আমরা কি কি তত্ত্বের সন্ধান পেলাম।

বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় সাধনাপথের মুল লক্ষ্য একই; বেদোপনিষদে যাকে বলা হয় 'অমৃতত্ব'-লাভ, তন্ত্রশাস্ত্রে তাকেই বলে 'পাশমুক্তি'। বৈদিক মতে বেদান্তকেই যেমন দর্শনের সারতত্ত্ব বলা হয়, তান্ত্রিকবাদে তেমনি ধরা হয় কুলার্ণবতন্ত্রে ব্যাখ্যাত শক্তিসাধনাকে। শাক্ততন্ত্রই ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের মুখ্যতন্ত্র; সর্বাঙ্গে এরই ছাপ মেখে বৈদিক হিন্দুধর্ম এ অঞ্চলে স্থিতিলাভ করেছে। কুলার্ণবতন্ত্র—কৌলধর্ম বা কৌলসাধকদের সাধনা-পদ্ধতির কথা।

উপনিষদে ভোগের কথা নেই কিন্তু কুল বা কৌলধর্মে যোগ ও ভোগের অপূর্ব সংমিশ্রণ রয়েছে। অথচ, উভয় শাস্ত্রই 'অসঙ্গ' বা অনাসক্তিকে জ্ঞানমুক্তির একমাত্র পথ বলে বর্ণনা করেছে। তাই তন্ত্রশাস্ত্রের মর্মবাণীর উদ্দেশ পাওয়া যাবে এই 'ভোগো যোগায়তে' অথবা প্রেয়ের মধ্য দিয়ে শ্রেয়োলাভের সাধনায়। শ্রেয়ের পথে শুধু ত্যাগের বা যোগেরই রাজত্ব।

কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান আর এ ত্রয়ীর সংশ্লেষণ দক্ষিণাচার পর্যন্ত শ্রেয়োবাদ ও প্রেয়োবাদের পথ একই। দক্ষিণাচারের সঙ্গে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান-পন্থার অপূর্ব সংশ্লেষণের তুলনা চলে। শ্রেয়ঃপন্থার সীমারেখা এখানেই টানা যায়, কিন্তু কুলধর্মের পথ এ সীমারেখাকে অতিক্রম করে বহুদূরে চলে গিয়েছে। সে পথে রয়েছে সাধকের চরম পরীক্ষার কথা, যা শ্রেয়ঃপন্থায় নেই।

* "অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্তিতম্।"

এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সাধক যে সত্যি সশরীরে জ্ঞানমুক্ত তা প্রমাণিত হবে।

তারপর আমরা পেয়েছি, কুলধর্মের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা। জেনেছি, এ পথযাত্রীর যোগ্যতার মান। সে যোগ্যতার বিচারক সাধকের গুরু। এ পথে গুরুর আদেশ ও উপদেশ ছাড়া এক পা-ও চলা যায় না।

গুরুকুলের কথাও আমরা জেনেছি। তারপর শুনেছি কুলার্ণব-তন্ত্রমতে কর্ম, ধর্ম ও জ্ঞানপথে মোক্ষলাভের স্বরূপের উপমা। এর সঙ্গে এসেছে যোগ ও ধ্যানের কথা, রাজযোগ, হঠযোগ, মনঃশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধির তত্ত্ব।

মন্ত্রজপ ও ধ্যান যোগেরই অঙ্গ। এরা দুটি সমধর্মী সহযোগী। ধ্যানে পরিশ্রান্ত হলে সাধক মন্ত্রজপ করেন, আবার মন্ত্রজপে ক্লান্ত হলে ধ্যানের জগতে প্রবেশ করেন। এ দুটি সাধনাঙ্গের ফলশ্রুতি একই।

আমাদের মত সাধারণজনের বহুকালের ধারণা যে তন্ত্রসাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য অষ্টসিদ্ধিলাভ আর কৃষ্ণষট্‌কর্মে কৃতিত্ব অর্জন। এর কারণ আমাদের তন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা। বীর সাধক অর্থাৎ বামচারী বা অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিকের কাছে এ-সব বিভূতির বা যোগলব্ধ ঐশ্বর্যের কোনো মূল্য নেই। এঁদের লক্ষ্য 'পরমহংসত্ব' বা জ্ঞানমুক্তি।

বৈদিক পন্থার শেষকথা হল 'সোঽহং' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আর এই মন্ত্রেই শুরু হয় বীরাচারীর অন্তর্যাগ। 'শিবো ভূত্বা শিবং যজতে' হল বীরাচারীর পূজার প্রধান তত্ত্ব। আরাধ্য দেবতা ও সাধকের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই—জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতা বোধই সে পূজার ভিত্তি।

এই 'ভোগো যোগায়তে' ও 'দেবী ভূত্বা তু তাং যজতে'র মাঝেই উদ্দেশ পাওয়া যাবে তন্ত্রশাস্ত্রের মর্মবাণীর; অষ্টসিদ্ধি ও ষট্‌কর্ম তন্ত্রশাস্ত্রের অপচ্ছায়া না হোক উপচ্ছায়া মাত্র।

পঞ্চম অধ্যায়

তান্ত্রিক আচার ঃ পঞ্চ 'ম'-কার সাধনা

ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি, মানুষ তার মধ্যে জাতিগত ও শ্রেণীগতভাবে বিভিন্নতার সৃষ্টি করেছে বটে কিন্তু সর্বত্রই তার মূল লক্ষ্য এক। সে লক্ষ্য ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি বা বিশ্বাত্মার মধ্যে জীবাত্মার ক্রম-বিলয়। পথ বিভিন্ন তাই পথযাত্রীর আচরণ, রীতি বা চালচলনও বিভিন্ন। এই বিভিন্ন পথে অগ্রবর্তী পথযাত্রীর দল যে যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও রীতিনীতিকে তাদের পথযাত্রার অনুকূল বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই সে পথের 'আচার' বলে গৃহীত হয়েছে। এই আচার-আচরণ বা নিয়মনিষ্ঠার ভিত্তি পূর্ববর্তীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত, তাই এর বিশেষ মূল্য রয়েছে।

তান্ত্রিক মতে মানুষের সাধনা ও আচার পূর্বজীবনের কর্মগত। পূর্বজন্মের কর্মফলই তার এ জীবনের সাধনার ভিত্তি। সঞ্চিত কর্মফল অনুসারেই রচিত হয় তার রুচি, চরিত্র ও ভাবাদর্শ। এই 'প্রারব্ধ' বা সঞ্চিত কর্মফল থেকে অব্যাহতি নেই; কোনোক্রমেই একে রোধ করা বা হ্রাস করা যায় না, যত অবাঞ্ছিতই তা হোক না কেন।

এই রুচি, চরিত্র ও ভাবাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তার এ জন্মের যোগ্য সাধনা-পথের সন্ধান করতে হয়। সে সন্ধান দেবেন কে? দেবেন তার গুরু; কারণ, এই শাস্ত্র সম্পূর্ণ গুরু-গম্য। আধুনিক বিচার-প্রণালীর ত কথাই নেই, শ্রুতি-স্মৃতির তুলনায়ও গুরুর নির্দেশ বা গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত উপদেশ ('সম্প্রদায়') এখানে অনেক বেশী প্রমাণসিদ্ধ। গুরুই বিচার করবেন সাধনা-পথের

কোন্‌টিতে শিষ্যের স্বাভাবিক অধিকার—কোন্ পথে চললে তার লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হবে।

পথগুলি আচার-ভিত্তিক, কাজেই সাধকভেদে আচারভেদ রয়েছে। সাধকে সাধকে রয়েছে শক্তির তারতম্য, অনেক ক্ষেত্রে সে বিভেদ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। যেমন, প্রবৃত্তিমার্গের সাধক অর্থাৎ যাঁদের পাশমুক্তি ঘটেনি, তাঁরা নিবৃত্তিমার্গের পথে হাঁটতে পারেন না; পাশমুক্তির চরম পরীক্ষাদানের যোগ্যতাও লাভ করেন না। তাই দক্ষিণাচারী ও বামাচারী উভয়েই তান্ত্রিক সাধক হলেও আচারগত প্রভেদ তাঁদের মধ্যে প্রবল তো বটেই, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি অন্যটির প্রতিকূল।

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের হিন্দুধর্ম তন্ত্রপ্রধান আর সে তন্ত্র শাক্ততন্ত্র। শাক্ততন্ত্রে আচার-ভিত্তিক বহুবিধ পূজাপ্রণালী প্রচলিত। এ-সব পূজার আচার-বিচারের সন্ধানে আমাদের প্রয়োজন নেই; আর প্রয়োজন নেই বেদাচার থেকে দিব্যাচার পর্যন্ত নয়টি ধাপের আচারগত সমস্যা নিয়ে। কাপালিক, ক্ষপণক, দিগম্বর, বীর ও দিব্য প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধকের মধ্যে কি কি আচারগত প্রভেদ, সে খুঁটিনাটির বিচারেও আমাদের কাজ নেই। আমরা এখানে শুধু এমন ক'টি তান্ত্রিক আচারের উল্লেখ করব যা তান্ত্রিক-জগতের সাধারণ সম্পত্তি। অর্থাৎ তন্ত্র বা তান্ত্রিক শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে সে-সব আচারের কথা মনে হয়।

এমনি দুটি কথার একটি দীক্ষা, অন্যটি অভিষেক।

সংক্ষেপে বলতে হলে, দীক্ষার দ্বারাই 'পাশমুক্তি' হয়, শুধু জ্ঞানের দ্বারা হয় না।* দীক্ষাই তন্ত্রজগতের একমাত্র ছাড়পত্র। তোরণদ্বারে এ ছাড়পত্র না দেখালে সে জগতে প্রবেশ লাভ করা যায় না। তন্ত্রসাধনায় যোগ্যতা বিচার করে দীক্ষা দান করেন সাধকের গুরু। দীক্ষার ব্যাপারে জাতি, বর্ণের কোনো বাছবিচার

*"দীক্ষৈব মোচয়ত্যূর্ধ্বং শৈবং ধাম নয়ত্যপি"

নেই ; স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে যে-কোনো হিন্দুই দীক্ষা নিতে পারে। একদা সারা পূর্বাঞ্চলে এ প্রথা ছিল অতিমাত্রায় ব্যাপক ; এখনো তা বহুপ্রচলিত। বিংশ শতকের শেষপাদেও বহু হিন্দু পরিবারেরই কুলগুরু বর্তমান ; তাঁরা পুরুষানুক্রমে পারিবারিক গুরু হিসাবে দীক্ষাদান করেন—শুধু গুরুবংশজাত বলেই তাঁরা গুরুপদবাচ্য, ব্যক্তিগত কোনো গুণের বলে নয়। এঁদের মধ্যে অনেকেরই না আছে বিদ্যা, না আছে নিয়মনিষ্ঠ তান্ত্রিক সাধনা। এর অবশ্যম্ভাবী ফল, তন্ত্রশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা ও তন্ত্রসাধনার অধোগতি ও অপযশ। সে কথা থাক।

দীক্ষা কাকে বলে ? সহজ কথায় একে ইষ্টমন্ত্রদান বলা চলে। মন্ত্রটি দৈবশক্তিরই প্রতীক ; গুরুর মুখ থেকে বের হয়ে এসে শিষ্যের দেহ, প্রাণ ও মন সঞ্জীবিত করে তোলে। একটিমাত্র দীপের স্পর্শে যেমন একে একে বহুদীপের সৃষ্টি হয়, তেমনি একজন মাত্র গুরুর সংস্পর্শে এসে ক্রমে ক্রমে বহু শিষ্য বোধিলাভ করে।

দীক্ষাদান হয় একটা শুভমুহূর্ত দেখে। এর জন্য বিচার্য বিষয় বহু : মাস, বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, লগ্ন, পক্ষ, স্থান প্রভৃতি। সে বিচার করেন সাধকের গুরু। সাধারণত সংক্রান্তি, চন্দ্রসূর্য-গ্রহণ ও মহাপূজা দিনে দীক্ষাদান প্রশস্ত। এ সম্পর্কে নানা তন্ত্র ও যামলের নানা মত।

দীক্ষাহীন মানুষের মন্ত্রজপ ও মন্ত্রপূজা নিষ্ফল ; প্রকৃতপক্ষে এ-সব আচারের কোনো অধিকারই তার নেই।

কোনো কোনো তন্ত্রের মতে মন্ত্রদানে শূদ্র ও নারীর সম্পর্কে কিছু কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। আবার কোনো কোনো তন্ত্রে এ দু দলকেও 'ওঁ' উচ্চারণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে সেটা মন্ত্রের শুরুতে ; শুরুতে ও শেষে দুবার নয়। দুবার, অর্থাৎ শুরুতে ও শেষে উচ্চারণ করতে পারেন মাত্র দ্বিজেরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা।

দীক্ষাদান করেন গুরু। নারীর পক্ষে গুরু হতে কোনো বাধা

নেই—নিজের জননী যদি গুরু হন তবে সাধকের সুফল হয় আট গুণ।

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে দীক্ষা সাত প্রকারের। সাধারণত দীক্ষা হয় যথারীতি শাস্ত্রাচার পালন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা হয় বর্ণ বা অক্ষরের সাহায্যে, কোনো ক্ষেত্রে তা হয়ে পড়ে দৈহিক কলাগত অর্থাৎ দেহের কোনো অংশ-বিশেষের সঞ্জীবনীর সূত্রে, কোথাও মাত্র গুরুর স্পর্শে, কোথাও বাক্যে—যাকে বলে বাগ্‌দীক্ষা, কোথাও দৃষ্টিতে, আর কোথাও চিন্তাসূত্রে। বিভিন্ন তন্ত্রে আরো অনেক প্রকার দীক্ষার কথা রয়েছে।

বলা বাহুল্য এ-সব তত্ত্ব আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়—তা হতেও পারে না। কারণ এগুলি সাধারণ বুদ্ধিগম্য নয়। এ যে-জগতের কথা সে-জগতে প্রবেশলাভ করতে হলে যে ব্যাপক প্রস্তুতির দরকার তার জন্য যথাযোগ্য গুরুরও যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শিষ্যের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়েরও। তবু আভাসে ইঙ্গিতে হয়ত কিছুটা বোঝা যাবে। কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করার জন্য একটা সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বামী বিবেকানন্দকে শুধু স্পর্শ দ্বারাই দীক্ষা দিয়েছিলেন; সে স্পর্শদীক্ষার ফলে স্বামীজীর যে দৈহিক ও মানসিক অবস্থান্তর ঘটেছিল তার যথাযথ কাহিনী স্বামীজী স্বমুখেই বলেছেন। সেই লিপিবদ্ধ অনুভূতির উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি:

"তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণ পদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়ালগুলির সঙ্গে গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে। তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল—আমিত্বের নাশেই

মরণ, সেই মরণ সম্মুখে—অতি সন্নিকটে ! সামলাইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো তুমি আমার এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন।' অদ্ভুত পাগল আমার ঐ কথা শুনিয়া খলখল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হস্তদ্বারা আমার বক্ষ স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন থাক, একেবারে কাজ নেই, কালে হবে।' আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ঐরূপ স্পর্শ করিয়া ঐ কথা বলিবামাত্র আমার সেই অপূর্ব প্রত্যক্ষ এককালে অপনীত হইল ; প্রকৃতিস্থ হইলাম, এবং ঘরের ভিতরের ও বাহিরের পদার্থ সকলকে পূর্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম।"

[শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ ; পৃঃ ৮৬]

বলা বাহুল্য কোন্ প্রকারে শিষ্যকে দীক্ষাদান করতে হবে তা নির্ভর করে গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি ও শিষ্যের গ্রহণ-ক্ষমতার ওপর। আধুনিক তান্ত্রিক দীক্ষা যে কেন কেবল শাস্ত্রাচারগতই হয় বা হবে, তার কারণ সহজেই অনুমেয়। গুরুর গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেয়ে পেয়ে এখন তিনি একেবারে লঘিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন ; 'গুরুগিরি' হিন্দুসমাজে অনেক অপযশ ও কুকীর্তি-কাহিনী রচনা করেছে।

তন্ত্রমতে দীক্ষাগ্রহণের পরে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও শূদ্রের শূদ্রত্ব দুই-ই লোপ পায়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে কোনো জাতিত্ব-ভেদ থাকে না। যদি শূদ্র কোনো ব্রাহ্মণের পূর্বে দীক্ষিত হয় তবে ব্রাহ্মণ দীক্ষালাভের পরে হয়ে পড়েন তার কনিষ্ঠ। দীক্ষিত শূদ্র হন তার জ্যেষ্ঠ। তন্ত্রজগতের সমাজ বিভিন্ন ; সেখানে সাম্যেরই একাধিপত্য। সে সমাজে সাম্প্রদায়িক বা বর্ণের কথা অচল।

নারীর পক্ষে দীক্ষাগ্রহণ কি বিধেয় ? দীক্ষা অবিধেয় নয় বটে, তবে এ ব্যাপারে তার স্বাধীন সত্তা অন্তত কুলার্ণব মানে না। সধবা দীক্ষিত হতে পারেন স্বামীর অনুমতি নিয়ে, বিধবা পুত্রের, আর কন্যা পিতার।

কিন্তু রাজপুত্র হলেই যেমন রাজ্যলাভ ঘটে না—প্রথমে হয় তার অভিষেক, তেমনি দীক্ষিত হলেই মানুষের মোক্ষলাভ হয় না, মোক্ষের পথে যাত্রার প্রথম ধাপে হয় তার অভিষেক। অভিষেক দুই প্রকার—'শাক্ত' ও 'পূর্ণ'। এই অভিষেক কেবল যে মন্ত্রসিদ্ধির সহায়ক, তাই নয়; শিষ্যের মনোরথ-সিদ্ধিরও এ একটা সোপান ("পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ")। তন্ত্রমতে মানুষের জন্ম হয় দক্ষিণাচারে অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে, দীক্ষা দ্বারা পরে তার পুনর্জন্ম ঘটে নিবৃত্তিমার্গে। তখন হয় তার পূর্ণাভিষেক। পূর্ণাভিষেকের পরে শুরু হয় তার চরম ও সর্বজয়ী সাধনা, যার শেষ হয় মহাপূর্ণ দীক্ষাভিষেকে বা বিরজা-গ্রহণাভিষেকে। দীক্ষার মত অভিষেকও সম্পন্ন করেন সাধকের গুরু। এ কথা পূর্বেও বলা হয়েছে।

তান্ত্রিকী কর্ম দ্বিবিধ : নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে সন্ধ্যা আর ইষ্ট ও কুলদেবতার পূজা। ব্রাহ্মণ তো বটেই, ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণের পক্ষেও সন্ধ্যা কর্তব্য—অবশ্য তান্ত্রিকী সন্ধ্যা।

নৈমিত্তিক কর্মের পর্যায়ে পড়ে কোনো বিশেষ সংকল্পে যজ্ঞ ও তপশ্চর্যা আর ব্রত।

দীক্ষার পরে সকলেরই তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনায়, তান্ত্রিকী মন্ত্রপাঠে আর তান্ত্রিকী গায়ত্রী জপে অধিকার জন্মে। বৈদিকী সন্ধ্যার মতই তান্ত্রিকী সন্ধ্যা দিনে তিনবার করতে হয়—প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে। বৈদিক সন্ধ্যার মত তখনই গায়ত্রী জপ করতে হয়। গৌতমীয়া তন্ত্রে সন্ধ্যা-প্রকরণের সবিশেষ আলোচনা রয়েছে।

এবার তান্ত্রিক মন্ত্রের কথা বলছি। অনেকের মতে তন্ত্রসাধনার গূঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে এই মন্ত্রের মধ্যে। বৈদিক মন্ত্রের সরল অর্থ বর্তমান; সেগুলি ভাষা-ভিত্তিক। কিন্তু তন্ত্রের মন্ত্র আপাত-অর্থহীন; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কতগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টি মাত্র।

কিন্তু তার মধ্যে যে কোনো কোনো স্থলে 'জাঙ্গুলী' মন্ত্রের প্রভাব রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। জাঙ্গুলী মন্ত্র দেহকে সাপের বিষ থেকে মুক্ত করতে পারে বলে ছিল আদিম বিশ্বাস। আজকাল সে-সব মন্ত্রের প্রচলন প্রায় উঠে গেছে।

তন্ত্রসারের মতে মন্ত্র তিন প্রকার—পুংমন্ত্র, স্ত্রীমন্ত্র ও নপুংসক মন্ত্র। এবার তাদের লক্ষণের কথা বলছি। মন্ত্রের অন্তে থাকে তার লিঙ্গ-চিহ্ন। যে মন্ত্রের শেষে হুঁ ফট্ তা পুংমন্ত্র; যার শেষে স্বাহা তা স্ত্রী; আর যার শেষ হয়েছে নমঃ দিয়ে তা ক্লীব।

বৈদিক ও তান্ত্রিক গায়ত্রীর রূপ বিভিন্ন। বৈদিক গায়ত্রী বা সাবিত্রী সূর্য-স্তুতি; তান্ত্রিক গায়ত্রী আরাধ্য দেবতার স্তুতি। কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করে বলছি।

বৈদিক গায়ত্রী বা সাবিত্রী মন্ত্র হল : "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥" বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে এটি পবিত্রতম বলে কথিত। সহজ ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় :

এসো আমরা সূর্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা সেই দেবতার বরেণ্য জ্যোতির ধ্যান করি যিনি রচনা করেছেন এই পৃথিবী, এই বায়ুমণ্ডল ও এই জ্যোতির্বৃত্ত। তিনি যেন আমাদের ধীশক্তির উদ্বোধন করেন।

শাস্ত্রমতে শুধু দ্বিজাতিরই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরই গায়ত্রী-পাঠে অধিকার রয়েছে; দ্বিজেতর বর্ণের নেই। তা ছাড়া, বৈদিক গায়ত্রী এক ও অদ্বিতীয়।

এবার দেখা যাক তান্ত্রিক গায়ত্রী কি প্রকার।

তান্ত্রিক গায়ত্রী আরাধ্য দেবতার স্তুতি, তাই দেবতাভেদে মন্ত্রের অদলবদল হয়, ফলে তান্ত্রিক গায়ত্রী বহু। এর মূল কাঠামোটা অবশ্য সর্বত্র থাকে একই। শাক্ত গায়ত্রীর রূপ হল :

"আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমাশ্চর্য্যে ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ"

বৈদিক গায়ত্রীর মত এখানেও সেই আছার ধ্যান ও কালী বা আছা অর্থাৎ আদিশক্তির কাছে অনুরূপ প্রার্থনা।

আরাধ্য দেবতাভেদে মোটামুটি শুধু দেবতার নাম পরিবর্তন হয় —আর দু-একটি বিশেষণও। আর কিছু নয়। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি তন্ত্রসার থেকে :

"ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ" —বিষ্ণুগায়ত্রী।
"তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ" —শিবগায়ত্রী।
"দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি
তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ" —রামগায়ত্রী।

আর উদাহরণ বাড়াবার প্রয়োজন নেই। এমনি রয়েছে অজস্র গায়ত্রী—নারায়ণ গায়ত্রী, দুর্গা গায়ত্রী, সূর্য গায়ত্রী, তারা গায়ত্রী, গরুড় গায়ত্রী, ভৈরবী গায়ত্রী, গোপাল গায়ত্রী ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, তন্ত্রসাধনায় দীক্ষাধারী সকলেরই সমান অধিকার। এ অধিকার কোনো বিশেষ আচারবদ্ধ মানুষের নয় ; শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব এই পঞ্চোপাসকেরই। ব্রাহ্মণ অবশ্য বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দুটি গায়ত্রীই পাঠ করতে পারেন, তবে কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে করতে হবে তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তন্ত্রসারের মতে প্রথমে বৈদিকী, পরে তান্ত্রিকী। এ ব্যবস্থা গায়ত্রী-সম্পর্কে হলেও, তান্ত্রিক ইষ্টমন্ত্রকে, অর্থাৎ গুরুদত্ত মন্ত্রকে, সবাই সর্বোচ্চ স্থান দান করেছে। ইষ্টমন্ত্র সকলের পক্ষেই পবিত্রতম মন্ত্র ; একে সর্বথা গোপন রাখতে হবে। ব্রাহ্মণের পক্ষেও যেখানে বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্রোচ্চারণে 'ওঁ' বলার কথা, সেখানে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণই প্রশস্ত।

পরম দেবতা গায়ত্রীর রূপকল্পনার মধ্যে তন্ত্রে তন্ত্রে কিছু কিছু

প্রভেদ রয়েছে। এখানে মহানির্বাণতন্ত্রমতে ত্রিবিধ রূপকল্পন বর্ণনা দিচ্ছি।

ক. প্রভাতে—রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, কুমারী ব্রহ্মশক্তি।

খ. মধ্যাহ্নে—শ্যামা, চতুর্ভুজা, (শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মহস্তে) যৌবনশালিনী বৈষ্ণবীশক্তি।

গ. সায়াহ্নে—শুক্লাম্বরধরা, বৃষারূঢ়া, ত্রিনয়না, পাশ, শূল, নরকপাল হস্তে, গলিতযৌবনা, বর্ষীয়সী, বরদায়িনী।

বৈদিক গায়ত্রী অনুসরণেই যে তান্ত্রিক গায়ত্রী রচিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তন্ত্র এ মন্ত্রটি সর্বজনীন করে তার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেছে বটে, কিন্তু সর্ব আচারে ক্রমে এই সর্বজনীনতা সংক্রামিত হয়ে তার কলঙ্কের পথই প্রশস্ত করেছে, তাকে সমৃদ্ধ করেনি। পঞ্চ 'ম'-কার সাধনা এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সে কথা পরে আসবে।

তান্ত্রিক আচারের মধ্যে পুরশ্চরণের কথা প্রায়শই শোনা যায়। কথাটির অর্থ কি? মন্ত্রজপে সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে প্রথমেই যে-কর্মের অনুষ্ঠান করা হয় তার নাম পুরশ্চরণ (মন্ত্রসিদ্ধয়ে 'পুরঃ' যৎ 'চর্যতে')। পুরশ্চরণ না হলে মন্ত্র সম্পূর্ণ ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না।

পুরশ্চরণ বলতে বোঝা যায় পাঁচটি কর্মের সমষ্টি। সে কর্মগুলি কি কি? (ক) প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে নিত্যপূজা, (খ) ইষ্ট-মন্ত্রজপ, (গ) তর্পণ অর্থাৎ পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে জলদান, (ঘ) হোম অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি, (ঙ) ব্রাহ্মণভোজন।

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে—

"পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ।
হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে॥"

এ কর্মগুলির সব-ক'টি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন না হলে যে ত্রুটি থেকে যায় তার পূরণ করা চলে ইষ্টমন্ত্র জপের দ্বারা। মন্ত্রজপের এমনি শক্তি।

কুলার্ণবতন্ত্র মন্ত্রজপের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ। এই তন্ত্রের মতে মন্ত্র অচেতন জড়পদার্থ নয় ; এর অন্তর্নিহিত চৈতন্যকে সাধনার দ্বারা প্রবুদ্ধ করতে হয়। কেবলমাত্র মন্ত্রজপের দ্বারাই জীব ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফললাভ করতে পারে। মন্ত্রজপ সর্বাপেক্ষা পবিত্র আচার। যদি শুদ্ধমত মন্ত্র জপ করা যায়, তবে অন্য সকল আচার ও কৃত্য বর্জন করা চলে ; লক্ষ্যভেদ করতে অন্য কোনো উপায়ের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু মন্ত্রজপ শুদ্ধমত, যথাবিধি হওয়া চাই, নইলে তা সুফলপ্রসূ না হয়ে হবে অপকারী, কুফলপ্রসূ। জপ তিনপ্রকার : মানসিক, উপাংশু ও বাচনিক। মন্ত্রের অর্থ স্মরণ করে মনে মনে জপ মানসিক, আরাধ্য দেবতার ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে শুধু নিজের শ্রবণ-যোগ্য করে যে জপ তা উপাংশু, আর যে জপ পরকর্ণেও যায়, তা বাচনিক। মানস জপ সর্বাপেক্ষা ভালো, উপাংশু মধ্যম আর বাচনিক অধম। অতি-বিলম্ব জপে ব্যাধি ও অতি-দ্রুত জপে ধননাশ হয় বলে কথিত।

তন্ত্রসারের মতে, "জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকো বিপ্রভোজনম্" অর্থাৎ জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাই পুরশ্চরণ। মন্ত্রসিদ্ধি কামনায় এ আচার পালন করতে হয়।

পুরশ্চরণের বিকল্প অর্থাৎ সমফলদ যে মন্ত্রজপ তা মোটামুটি সকল তন্ত্রেই স্বীকৃত। শিবধর্মে লেখা রয়েছে, মন্ত্রজপে সর্বযজ্ঞের ফল লাভ হয়।

তা যাই হোক, পুরশ্চরণ যে বেদবিহিত 'পঞ্চমহাযজ্ঞে'র সোদরোপম তাতে সন্দেহ নেই। এই পঞ্চাঙ্গ মহাযজ্ঞের পাঁচটি অঙ্গ হল : বেদপাঠ (ব্রহ্মযজ্ঞ), অতিথিসৎকার (নৃযজ্ঞ), শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি (পিতৃযজ্ঞ), দেবতাপূজা (দেবযজ্ঞ), ও ইতর প্রাণীর সেবা (ভূতযজ্ঞ)। পুরশ্চরণকে এই পঞ্চযজ্ঞেরই একটু ইতরবিশেষ করে নূতন রূপ দেওয়া হয়েছে। মূলত যা বৈদিক পঞ্চযজ্ঞ তাই তান্ত্রিক পুরশ্চরণ।

নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজার সম্পর্কে আমরা সর্বদাই 'ষোড়শোপচার', 'দশোপচার' ও 'পঞ্চোপচারে'র কথা শুনতে পাই। এই উপচার বা পূজার জিনিস কি কি ?

পাদ্য বা পা ধোবার জল, অর্ঘ্য বা চন্দন, ধান দূর্বা মালা ইত্যাদি, আচমনীয় বা হাত-মুখ ধোবার জল, স্নানীয় বা স্নানের জল, বসন, ভূষণ, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, অমৃত বা প্রকৃষ্ট দেবভোগ্য বস্তু, তাম্বুল, তর্পণ ও নমস্কার—এ-ই ষোড়শোপচার। মতান্তরে 'অমৃত' ও 'তর্পণ'-এর পরিবর্তে 'আসন' ও 'স্বাগত'।

দশোপচারে বাদ পড়েছে স্নানীয়, বসন, ভূষণ, অমৃত, তাম্বুল, তর্পণ ও নমস্কার ; কিন্তু যোগ হয়েছে 'মধুপর্কে'র। 'মধুপর্কে'র পাঁচটি উপাদান : মধু, ঘৃত, দধি, শর্করা ও জল।

পঞ্চোপচারের অঙ্গ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য ; একেবারে সাদাসিধা পূজা যা নিত্য হয়।

কুলার্ণবতন্ত্র বলেছে, ধূপ সমস্ত ক্লেদ, সমস্ত ধূত বা বন্ধন দূর করে পরমানন্দ দান করে আর দীপ দূর করে দেয় অজ্ঞানের কৃষ্ণছায়া, ঘোর অন্ধকার ও অহমিকা। দীপ পরাতত্ত্ব বা পরম সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে।

পঞ্চোপচারের মত পঞ্চগব্যও সকল পূজার অঙ্গ। এই গো-জাত দ্রব্যগুলি কি কি ? 'ক্ষীরং দধি তথা চ আজ্যম্ মূত্রং গোময় এব চ পঞ্চগব্যম্।' অর্থাৎ দুধ, দই, ঘি, মূত্র ও গোবর। বেদে 'গোঘ্ন' শব্দ ব্যবহারে হিন্দুর গোহত্যার যে পাপ হয়েছে তার পুরোপুরি প্রায়শ্চিত্ত করেছে তন্ত্র,—গোজাতিকে পবিত্রতম প্রাণিরূপে মান্য করে।

তন্ত্রাচার বহুবিধ, নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র আলোচনায় সম্ভবপর নয় ; আর তা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। এখানে আমাদের লক্ষ্য এমন-সব আচার

যার কথা তন্ত্রের কর্মকাণ্ডের অচ্ছেদ্য অংশ বলে সবারই মনে পড়ে।

এমন আর দুটি আচার বা কৃত্যের কথা সংক্ষেপে বলা যাক। একটি ভৈরবী-চক্র, অন্যটি শবসাধনা। বলা বাহুল্য, দুটিই বামাচারী বা নিবৃত্তি মার্গের সাধকের কৃত্য অর্থাৎ যাঁরা বীরধর্মী, 'সোঽহং' মন্ত্র-সিদ্ধিতে যাঁদের জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদজ্ঞান দূর হয়েছে।

ভৈরবী-চক্রের সাধারণ অর্থ (কুলার্ণবতন্ত্র-মতে)—যে 'চক্রের' অর্থাৎ তান্ত্রিক-সাধক-মণ্ডলীর মধ্যে ব'সে পঞ্চ ম-কার সাধন করা হয়। এই ভৈরবী-চক্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা আনন্দ ভৈরবী ও আনন্দ ভৈরব। এ চক্র এঁদেরই ধ্যানচক্র। আনন্দ ভৈরবীর চিত্র হল নবযৌবনশালিনী, হাস্যে বদনকমল উজ্জ্বল, নৃত্যগীতে পরম উল্লসিত, নানা অলঙ্কারে বিভূষিত, পরিধানে অপরূপ বসন, হস্তে বর ও অভয় অর্থাৎ ভৈরবী বরাভয়দাত্রী।

আনন্দ ভৈরবের মূর্তি অপূর্ব-সুন্দর, কর্পূরের মত শ্বেতশুভ্র, কমলদলের মত আয়তনয়ন, দেহ দিব্যবসনভূষণে বিভূষিত, বামহস্তে সুধাপূর্ণ পাত্র আর দক্ষিণহস্তে মাংস, মদ্য ও মুদ্রা।

চক্র পঞ্চ ম-কার সাধনারই অঙ্গবিশেষ। কাজেই 'ম'কারের অর্থ, অর্থাৎ মদ্য, মাংস ও মুদ্রা তত্ত্বের আলোচনা পরে আসবে।

চক্রে বসলে জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটে, কাজেই সেখানে পুরুষেরা সবাই শিব আর নারীরা সবাই শক্তি—ভৈরব বা ভৈরবী। সবাই সমান—সবাই সামাজিক বন্ধনহীন, পাশমুক্ত। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে কোনো বিভেদ নেই আর বিভেদ নেই শিব ও শক্তিতে। কিন্তু চক্রভঙ্গের পরে সব সামাজিক বন্ধনগুলিই ফিরে আসে।

যে-কোনো সময়ে এ শুভচক্রের অনুষ্ঠান করা চলে।

তারপর শবসাধনার কথা। শবসাধনা কোন্ স্থানে করা প্রশস্ত? শূন্যগৃহে, নদীতীরে, পর্বতের ওপরে, নির্জন স্থানে, বিল্বমূলে ও শ্মশানে। কোন্ বারে ও তিথিতে? ভৌম বারে

অর্থাৎ মঙ্গলবারে, কৃষ্ণ বা শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে নিশাভাগে।

শবসাধনায় কোন্ কোন্ শব গ্রাহ্য ?

সদ্যোমৃত পুরুষের দেহ—নারীর নয়। অপঘাত-মৃত শবদেহ প্রশস্ত অর্থাৎ যারা যষ্টি, শূল বা খড়্গাঘাতে মরেছে, বা জলমগ্ন হয়েছে বা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেছে। শব তরুণবয়স্কের ও চণ্ডালজাতীয় মানুষের হলে সুফলের সম্ভাবনা বেশি। ক্লীব, রোগগ্রস্ত ও বৃদ্ধের শব পরিত্যাজ্য।

শবের ওপর কিভাবে বসতে হয় ? অশ্বারোহণের ভঙ্গীতে।

আমরা শুধু শবসাধনার বহির্জগতের কাহিনীর উল্লেখ করেছি. সাধনার মন্ত্র বলে দেবেন গুরু। তন্ত্রসাধনায় একাধিপত্য গুরুর ; তাঁর আদেশ ও অনুমতি ছাড়া এ পথে একটি পা-ও বাড়ানো চলে না।

কিন্তু বিংশ শতকের শেষ ধাপে কি আর শবসাধনার কিছু অবশিষ্ট রয়েছে ? ভৈরবী-চক্রের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে, কিন্তু সে-সব চক্রে এখন কুচক্রীরাই অধিষ্ঠিত ; তারা মদনানন্দ রসেরই রসিক, পরমানন্দের নয়।

এ পর্যন্ত আমরা তান্ত্রিক আচার-বিচারের কথাই বলেছি, অভিচারের অর্থাৎ অপরের অনিস্ট বা নিজের ইষ্টসাধনের জন্য তন্ত্রোক্ত নানা প্রক্রিয়ার কথার উল্লেখ করিনি। অভিচারের যা-কিছু কাহিনী তা সবই পোরা রয়েছে কৃষ্ণ-ষট্‌কর্ম ও অষ্টসিদ্ধির ঝুলিতে। সে ঝুলিটা শুধু আয়তনেই ছোট নয়, তান্ত্রিক সাধনা-পথের পাথেয়ও তার মধ্যে কিছু নেই। হয়তো কোনো কোনো তান্ত্রিক ক্রিয়াসক্ত মানুষ নিজের মাহাত্ম্যবৃদ্ধির জন্য এ-সব অলৌকিক শক্তির রূপকল্পনার সৃষ্টি করেছেন, হয়তো-বা কেউ কেউ পুরুষানুক্রমে তান্ত্রিক পৌরোহিত্য-বৃত্তিকে অর্থাগমের পথে পরিণত করতে নিজের মধ্যে এ-সব কল্পিত শক্তি আরোপ করেছেন। তা

যাই হোক, তন্ত্রসাধনার সঙ্গে এদের অঙ্গাঙ্গি সংযোগ জনসাধারণের মনে একেবারে চিরতরে গাঁথা হয়ে রয়েছে। আর, না-ই বা থাকবে কেন? অভিচার-প্রক্রিয়া তো তন্ত্রের জন্ম-সহচর। তান্ত্রিক ধর্মের দীর্ঘ ইতিহাসের আরম্ভ থেকেই এদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে।

তাই, ষট্‌কর্মের মধ্যে দু-তিনটি প্রক্রিয়ার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করব। কিন্তু এ-সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কেউ ফললাভের চেষ্টা করবেন না বলেই বিশ্বাস করি।

প্রথমেই ধরা যাক বশীকরণের মন্ত্র। একে বলে চিটিমন্ত্র। মন্ত্রটি কি?

"ওঁ চিটি চিটি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।" এর প্রয়োগবিধি কি? যাকে বশ মানাতে হবে তার নাম ও মন্ত্রটি প্রথম লিখতে হবে তালপাতায়; তারপর সেটি দুধ ও জলে রেখে রাত্রে তা আগুনে ফুটিয়ে নিলেই সেই 'অমুক' প্রক্রিয়াকারীর বশীভূত হবে। এ মন্ত্রটি যদি তালপাতায় লিখে ভদ্রকালী-মন্দিরে প্রোথিত করা যায়, তবে সে তান্ত্রিকাচারীর শক্তিতে সর্বজন্তু বশীভূত হয়।

এবার দেখা যাক বিদ্বেষণ-প্রক্রিয়া। এর মন্ত্র: "ওঁ নমো ভগবতি শ্মশানকালিকে অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন্ হন্ পচ্ পচ্ মথ্ মথ্ হুং ফট্ স্বাহা। মন্ত্ররাজেন অমুনা হোময়েৎ প্রয়তঃ সুধীঃ।" এই মন্ত্রে কটু তেলে নিমপাতা ভিজিয়ে তা দিয়ে হোম করলে দুজনের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা যায়।

মোষ ও ঘোড়ার মলের সাথে গো-মূত্র মিশিয়ে তা দিয়ে যে দুটি লোকের নাম লিখবে তাদের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হবেই।

উচ্চাটন-বিধির কথাও বলি। এর মন্ত্র "ওঁ নমো কাকতুণ্ডি ধবলামুখি অমুকমুচ্চাটয় উচ্চাটয় হুং ফট্।" এই মন্ত্রটি লিখতে হবে নিমপাতায় কাকের পাখায় তৈরী কলম দিয়ে আর সেখানেই লিখতে হবে শত্রুর নাম মোষ ও ঘোড়ার মলের কালি করে। কিন্তু এটাই

প্রক্রিয়ার শেষ নয়। এর পরে হবে হোম। সে হোম হবে নিমগাছের ওপর যে কাকের বাসা থাকে তার খড়কুটো দিয়ে। এ হোমের আগুন হবে শ্মশানের আগুন আর কাঠ হবে ধুতুরার। হোমে ঘির বদলে ব্যবহার করতে হবে নরতেল অর্থাৎ মানুষের চর্বি ও মরিচ আর ঝাঁঝালো তেল। তারপর হবে ধবলামুখী দেবীর পূজা আর হোম হবে উচ্চাটনের মূলমন্ত্রে নিমপাতায় আর সর্ষের তেলে। এ হোমের শেষে যে ভস্ম থাকবে তা যে-কোনো শত্রুর বাড়িতে ছড়িয়ে দিলে পরেই তার উচ্চাটন অবশ্যম্ভাবী।

এবার অষ্টসিদ্ধির মধ্যে 'অদর্শন-ক্রিয়া'র কথা বলে আমরা এ আসর থেকে অদৃশ্য হব।

অদৃশ্য হতে হলে চোখে একরকম কাজল দিতে হয়। কিন্তু এ কাজলটি তৈরি করা সহজ নয়। কাজল হবে অবশ্য প্রদীপ থেকেই কিন্তু প্রদীপে জ্বলবে মানুষের দেহের চর্বি, তা থাকবে পাঁচটি মানুষের মাথার খুলিতে, আর সলতে পাকাতে হবে আকন্দ, শাল্মলী বা শিমুল, কার্পাস, পদ্মকাঠের সাথে পাট দিয়ে।

তৈরি হবে পাঁচরকম কাজল। এ কাজল যেখানে সেখানে তৈরি হলে চলবে না ; সব কাজই সম্পন্ন করতে হবে শিবমন্দিরে। তারপর এ পাঁচরকম কাজলই একত্র মেশাতে হবে। মেশাবার মন্ত্র ; "ওঁ হুঁং ফট্ কালি কালি মাংসশোণিতং খাদয় খাদয় দেবি মা পশ্যতু মানুষেতি হুঁং ফট্ স্বাহা।"

এবার একবার যে-কেউ এ কাজল চোখে পরবে সে-ই হবে অদৃশ্য ! নিশ্চয়ই যতক্ষণ কাজল চোখে থাকবে ততক্ষণই এ অদর্শনের মেয়াদ থাকবে—চিরতরে নয়।

এ-সব প্রক্রিয়া-সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণাসৃষ্টির জন্য কয়েকটির সংক্ষেপিত বর্ণনা দেওয়া হল, তবে বলে দেওয়া ভাল যে, এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। অর্থাৎ তন্ত্রে তন্ত্রে মতান্তর তো রয়েছেই, এমনকি নানা প্রক্রিয়ান্তরের কথাও রয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ-সকল নিতান্ত স্থূল ও লৌকিক তুকতাকের সঙ্গে তন্ত্রের দর্শন বা তান্ত্রিক ধর্মের মূলগত কোনো সম্পর্ক নেই। ষট্কর্ম বা অষ্টসিদ্ধি কোনোটিই তন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি, করেছে শুধু এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি।

তন্ত্রসাধনায় অবশ্য সাধককে যে নানা প্রক্রিয়ার শরণ নিতে হয়, সে-সব প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য সাধকের পাশমুক্তির সহায়তা করা। তন্ত্রমতে সে পাশমুক্তি ঘটে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে; এ-সব প্রক্রিয়া করা হয় সে উদ্দেশ্যেই।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মানুষের দেহান্তর্গত শিবশক্তি; তার অবস্থিতি নিচে বর্ণিত মূলাধার-চক্রে। সেখানে কুণ্ডলীভাবে, নতমুখে, কতকটা নিদ্রিত সাপের মতো এই শক্তি বিরাজিত। পদ্মাকৃতি মূলাধার-চক্রে পৌঁছে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে হলে পর পর ছয়টি চক্র বা আবর্ত পার হতে হবে।

কথাগুলি আরো স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী রয়েছে। এদের মধ্যে চৌদ্দটি উল্লেখের যোগ্য। এই চৌদ্দটির মধ্যে আবার এই তিনটি প্রধান: ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। প্রধান এই কারণে যে, এদের মধ্য দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়। এই তিনটি নাড়ীর মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠতম হল সুষুম্না। এই সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের নিম্নসীমায় যার অবস্থিতি সেই মূলাধার থেকে মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। ইড়া ও পিঙ্গলা রয়েছে যথাক্রমে এরই বাঁয়ে ও ডাইনে, কিন্তু মেরুদণ্ডের বাইরে।

এই নাড়ী তিনটি ছাড়া, যে ছয়টি চক্রের উল্লেখ করা হয়েছে তান্ত্রিক সাধনায় তারাও নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে চক্রগুলির আকৃতি পদ্মফুলের মতো এবং অবস্থিতি দেহের বিভিন্ন স্থানে। এখানে তাদের সবিশেষ বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

তন্ত্রমতে মূলাধার চক্রের অবস্থান মানুষের দেহের ঠিক মধ্যস্থলে —যোনি বা লিঙ্গ ও গুহ্যের মাঝামাঝি ; আকার ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের সবচেয়ে সরু কোণটা রয়েছে ওপরের দিকে। কল্পিতরূপে এটি একটি চার-পাপড়িওয়ালা সোনার রং-এর পদ্মের মত। চারটি পাপড়ির মধ্যে রয়েছে চার রকমের আনন্দের স্পর্শ— যোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বীরানন্দ। সুষুম্নার 'মূল' ও কুণ্ডলিনী শক্তির (এখানেই অবস্থিতি-হেতু) 'আধার' হওয়ায় এই চক্রের নাম 'মূলাধার'।

এই মূলাধার চক্রের ঠিক ওপরেই রয়েছে স্বাধিষ্ঠান বা অধিষ্ঠান চক্র। কল্পিতরূপে এটি একটি ছয়-পাপড়িওয়ালা পদ্ম, আগুনের মত উজ্জ্বল ও হীরার মত নির্মল।

তারো ওপরে, নাভির বিপরীত দিকে, মেরুদণ্ডের মধ্যে রয়েছে দশদলপদ্ম মণিপূরক বা মণিচক্র। এর দলে দলে নানা জ্যোতি, নানা মণি-মাণিক্যের ঝলক। মণি-মাণিক্য খচিত বলেই এটিকে বলা হয় মণিপূর।

এই মণিপূরের ওপরে রয়েছে দ্বাদশদলে সুশোভিত হৃদ্দেশে অবস্থিত অনাহত চক্র ; এর মধ্যে অধিষ্ঠিত রয়েছেন অযুত সূর্যবৎ তেজঃপুঞ্জ, যাকে বলা হয় বাণলিঙ্গ। ইনি শব্দব্রহ্মময় অর্থাৎ শব্দ-রূপী ব্রহ্ম। অনাহত কাকে বলে ? যা আহত হয়নি, আঘাত পায়নি অর্থাৎ অক্ষত। কল্পিতরূপে অনাহত পদ্মে অনাহত শব্দ শোনা যায়। তা শুনতে পারে অবশ্য শুধু সাধকেরা। তাই তাঁরা এটিকে বলেন অনাহত পদ্ম।

অনাহত পদ্মের ওপরে রয়েছে বিশুদ্ধ পদ্ম বা বিশুদ্ধচক্র বা আকাশচক্র। কল্পিতরূপে এটি ষোড়শদল ; এটি মানুষের হংসমন্ত্র-জপকে বিশুদ্ধ করে ; অর্থাৎ হংস থেকে সোঽহং, সোঽহং থেকে ওঁ-এ পরিণত করে। তাই একে বলা হয় বিশুদ্ধচক্র।

এরো ওপরে, ভ্রূদ্বয়ের মাঝে রয়েছে আজ্ঞাচক্র। এর মধ্যে

গুরুর আজ্ঞা সঞ্চারিত বা ব্যাপ্ত হয়, তাই একে বলা হয় আজ্ঞাচক্র। মন এখানে উঠলে জ্ঞানচক্ষু বা দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।

এই হল ষট্‌চক্র; এই ষট্‌চক্রভেদই তান্ত্রিক যোগসাধনের লক্ষ্য এবং তান্ত্রিক সাধনার মূলতত্ত্ব। তবু শিবচক্র, বিন্দুস্থান বা সহস্রদল-পদ্মে পৌঁছতে তখনো থাকে দুটি চক্র বাকি; কৈলাসপুরী ও বোধনীচক্র; তার পরেই শিবচক্র।

তান্ত্রিক সাধকের লক্ষ্য হল মূলাধারে শিবশক্তিকে অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে, এর কুণ্ডলীভাব ঘুচিয়ে, একে ঊর্ধ্বমুখী করে শিবচক্রে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করা; আবার কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে মূলাধারে ফিরিয়ে আনা।

এই লক্ষ্যভেদের সহায়তা করে যোগসাধনা।

এবার তাই একটু যোগসাধনার কথা বলছি।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতাবোধের নামই যোগ। যোগের অঙ্গ আটটি; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

যম কাকে বলে? অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, দয়া, ঋজুতা, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ।

তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিকতা, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তবাক্যশ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ ও হোম এই দশবিধ আচারকে বলা হয় নিয়ম।

প্রাণায়াম বলে এক বিশেষ প্রকারে বায়ুগ্রহণ, বায়ুধারণ ও বায়ু-বর্জনকে। বায়ু গ্রহণ করতে হয় ইড়া নাড়ী দিয়ে, ধারণ করতে হয় সুষুম্নায়, আর বর্জন করতে হয় পিঙ্গলা দিয়ে। নিয়মিত এই অভ্যাসের ফলে সুষুম্নার পথ খুলে যায় আর বায়ুপ্রবাহ ভিতরকার শক্তিকে জাগ্রত করে।

ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় থেকে সবলে আকর্ষণ করাকে বলে প্রত্যাহার। দেহের কতগুলি বিশিষ্ট স্থানে বায়ু ধারণ করাকে বলে ধারণা।

ধ্যানের কথা পূর্বেই বলেছি আর সমাধি ও যোগ তো সমার্থক। তান্ত্রিক আচার-বিচারের কাহিনীর এখানেই ছেদ টানা যাক। এবার এল পঞ্চ ম-কার সাধনার কথা।

তন্ত্রজগতে পঞ্চ ম-কার সাধনা এক চিরকুহেলিকাময় রাজ্য। এই গূঢ় সাধনার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে তন্ত্র একদিকে যেমন পরম রহস্যময় হয়ে রয়েছে, তেমনি সুস্পষ্ট কারণে তাকে বহুস্থলে ঘৃণ্য ও অপাংক্তেয় করে রেখেছে। আধ্যাত্মিক সাধনার মন্দিরে গুটিকত নিতান্ত স্থূল উপচারের প্রবর্তন কে করেছিলেন এবং ঠিক কোন্ সময়ে এটা ঘটেছিল তা বলা দুষ্কর; তবে অনুমান, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতক থেকে এর শুরু এবং সারা পূর্বাঞ্চল জুড়ে ছিল এর রাজত্ব। বাঙলায় উন-বিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল এর প্রভাব ও প্রচলন।

এর নামকরণ হয়েছে অবশ্য বর্ণের পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ 'ম' থেকে।* এই স্থূলবস্তুগুলির নামের আদিতে রয়েছে 'ম'; মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। মুদ্রা শব্দটি ছাড়া আর সবই সহজবোধ্য; মুদ্রা মানে এখানে টাকা পয়সা নয়—মুদ্রার অর্থ মদের চাট, শস্যজাতীয় দ্রব্য থেকে তৈরি। যথা, চানাচুর, ফুলুরি, বেগুনি।

আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বস্তুসর্বস্ব, নিরেট তামসিক দ্রব্যগুলির সম্পর্ক নিতান্তই অসঙ্গতিপূর্ণ ও রহস্যময়। এই বিসদৃশ সম্পর্ক, বিশেষ করে তন্ত্রের জনপ্রিয়তার সূত্রে যে সমাজের পক্ষে চরম অকল্যাণকর হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সামাজিক বিচারে তাই তন্ত্র নেহাতই দোষী; তার কলঙ্ক দুরপনেয়। আমরা এ বিষয়ে একমত।

কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে এখানে আমাদের বিচার্য ধর্মানুগত আচার; সমাজে তার বিকৃতির ইতিহাস প্রথমে আমরা

---

* মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যশ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
ম-কার পঞ্চকং দেবি! দেবতাপ্রীতিকারকম্॥

—কুলার্ণবতন্ত্র

আলোচনা করব না। সহজযানের মতবাদের ভিত্তিতে যেমন বৌদ্ধ-ধর্মের বিচার করা চলে না, নেড়ানেড়ীর প্রমত্ততা যেমন বৈষ্ণব ধর্মের মাপকাঠি হতে পারে না, তেমনি স্থূল পঞ্চ ম-কার যজনও তন্ত্রসাধনার সত্যরূপ ব্যক্ত করতে পারে না।

আমরা তাই ধর্মগত আচারের ভিত্তিতেই এই রহস্যভেদের চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, যাঁরা সত্যিকার তান্ত্রিকসাধক তাঁদের কাছে পঞ্চ ম-কার সাধনা একটা রহস্যময় ব্যাপার নয়; কারণ তাঁরা এই সাধনার মারফতে তাঁদের ভাবাদর্শকে কতগুলি স্থূল বস্তুর সাহায্যে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তন্ত্র যখন সাধারণের ধর্ম হয়ে পড়ল, তখন ধ্যান জগতের সেই ভাবাদর্শ পরিণত হল বস্তু-জগতের স্থূল বিষয়ে। ধ্যানের তত্ত্ব হয়ে ওঠল সম্ভোগের সামগ্রী!

কথাটা আরো স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

তন্ত্রসাধকদের স্তর বিভাগ করেছে তাঁদের সবাইকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। এই শ্রেণীগত বিভাগে তাঁরা কেউ দিব্য, বা কৌল, কেউ বীর, কেউ পশু। এঁদের স্বরূপের কথা আমরা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি।

পাশবদ্ধ সাধকদের, অর্থাৎ পশুদের বা দক্ষিণাচারী সাধকদের, পঞ্চ ম-কার সাধনার অধিকার নেই। বামাচারীরাও, মাত্র কৌলস্তরে উন্নীত হলেই, এ সাধনায় ব্রতী হতে পারেন। পঞ্চ ম-কার সাধনার অধিকার শুধু দিব্যাচারীর বা কৌলধর্মীর।

পুনরুক্তি হলেও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ সাধনা কৌল সাধকদের চরম পরীক্ষা; অবশ্য গুরুর আদেশ ও নির্দেশ ছাড়া এ পথে এক পা-ও হাঁটা চলে না। এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে কৌলসাধক জ্ঞানমুক্ত বা পাশমুক্ত হয়ে পরমহংস বা জীবন্মুক্ত হবেন।

কৌলদের দৃষ্টিতে এই পাঁচটি স্থূল বস্তু কোন্ কোন্ ভাবাদর্শের দ্যোতক?

মদ্য কি? ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে নিঃসৃত, বা পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান থেকে

জাত, অমৃতরস যা পান করলে সমগ্র বহির্জগতের সত্তা সাধক বিস্মৃত হন।

জ্ঞান-খড়্গে যিনি পাপপুণ্যরূপী দুটি পশুকেই বধ করেছেন তিনিই মাংসাশী। আবার কোনো কোনো তন্ত্রে, যেমন আগমসার-তন্ত্রে, বাচিক সংযমকে বলা হয় মাংসভক্ষণ অর্থাৎ কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ; এই নিয়ন্ত্রণও সাধনার অঙ্গ। মাংস ভক্ষণে যেমন দৈহিক ও তার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তি বেড়ে যায়, বাক্‌সংযমেও তাই ঘটে। কৌলদের ভাষায় তাই মাংস ভক্ষণের অর্থ বাক্‌সংযম।

মৎস্য বলতে এখানে দুটি বড় বড় মাছের কথা আসে। একটি চলে গঙ্গায়, অন্যটি যমুনায়—দুটি নামজাদা নদীতে। গঙ্গা ও যমুনা হল ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর উপমা ; তাদের ভেতরে ঘোরে ফেরে বায়ুরূপী দুটি মাছ ; এদের নিয়ন্ত্রণ হয় প্রাণায়ামে। অর্থাৎ মৎস্য-ভক্ষণ মানে প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করা। প্রাণায়াম যোগসাধনার একটা বিশিষ্ট অঙ্গ।

মুদ্রার মর্মগত অর্থ কি ? কৌলদের মতে, শিবচক্রে বা সহস্রদল-পদ্মে যে পরমাত্মার অবস্থান তাঁরই সম্যক্ জ্ঞানের নাম মুদ্রা। এই আত্মজ্ঞান বা মুদ্রাজ্ঞানই পাশমুক্তির একমাত্র পথ। কাজেই পঞ্চম-কার সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ হয়েছে 'সোঽহং' জ্ঞান—গভীর আত্মানু-ভূতি। এই সত্যানুভূতির দ্যোতকই মুদ্রা।*

পরিশেষে মৈথুনের কথা। সাধক যখন শিবচক্রে বা সহস্রদলে গিয়ে পৌঁছেন, অর্থাৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দূর হয়ে যখন একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সাধক যে পরমানন্দ অনুভব করেন তার নামই মৈথুন। কথাটা অন্যভাবেও বলা চলে। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে সাধক ক্রমে ক্রমে করেন ষট্‌চক্রভেদ।

* 'মহানির্বাণ তন্ত্রে'র ব্যাখ্যা একটু অন্য ধরনের। হৃদয়স্থিত আশা, তৃষ্ণা, লজ্জা প্রভৃতিকে জ্ঞানাগ্নির সাহায্যে 'ভক্ষণ করা' অর্থাৎ বশে আনার নাম 'মুদ্রা'।

পরে সেই শিবশক্তিকে সহস্রদলপদ্মে শিবের সঙ্গে---জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিকে মিলিত করেন। এই মিলনের নামই মৈথুন। পরাশক্তির সঙ্গে অভেদ-বুদ্ধিতে সাধকের যে মিলন, তন্ত্রমতে তাই প্রকৃত মৈথুন।

অর্থাৎ, কৌলাভিধানে পঞ্চ ম-কার সাধনা একটা পুরোপুরি অন্তর্যজন—যোগ-ধ্যান জগতের কাহিনী। এটা বাইরের কোনো আনুষ্ঠানিক পূজাই নয়। এ অন্তর্যজন পঞ্চাঙ্গ; কতগুলি নিতান্ত স্থূলবস্তু দিয়ে এই অঙ্গগুলির উপমা দেওয়া হয়েছে মাত্র। তবে যোগ ও ধ্যান জগতের সূক্ষ্মভাবাদর্শের সঙ্গে এই জাতীয় স্থূলবস্তুর উপমা সুষ্ঠু ও সঙ্গত কিনা তা বিবেচ্য। এ স্থলে সূক্ষ্মলোকের কথা সর্বত্রই উপমান আর স্থূলবস্তুগুলি সর্বত্রই উপমেয়। উপমান ও উপমেয়ে রয়েছে বিরাট স্তরভেদ। কিন্তু হয়ত কৌলাভিধানে এ উপমার কথাই নেই—তা এসেছে পরবর্তীকালে; অনধিকারী সাধকের কাছ থেকে।

এবার তন্ত্রসার পঞ্চ ম-কার সাধনার কথা কি বলেছে দেখা যাক্।*

"সুরা শক্তিঃ শিবো মাংসং তদ্ভোক্তা ভৈরবঃ স্বয়ং।
তয়োরৈক্যে সমুৎপন্ন আনন্দো মোক্ষ উচ্যতে॥
আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকং দ্রব্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে॥

* *

পুণ্যাপুণ্যং পশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ।
পরে লয়ং নয়োচ্চিত্তং পলাশীতি নিগদ্যতে॥

* *

পরশক্ত্যাত্মমিথুন সংযোগানন্দ নির্ভরাঃ।
মুক্তাস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদিতরে স্ত্রীনিষেবকাঃ॥"

* এ শ্লোকগুলি অবশ্য কুলার্ণব তন্ত্র থেকে উদ্ধৃত।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বা শিবশক্তিই মদ আর শিবই মাংস আর স্বয়ং ভৈরবই তার ভোক্তা। শিব ও শক্তি যখন মিলিত হন তখন যে আনন্দের উৎপত্তি হয় তার নামই মোক্ষ। সেই আনন্দই ব্রহ্ম, সেই আনন্দই মোক্ষ।

[সাংখ্যদর্শনের মত তন্ত্রও সেই একই কথা বলে। প্রকৃতি ও পুরুষ ; শক্তি ও জড়—এ দুয়ের মিলনে হল বিশ্বসৃষ্টি। শক্তি ও জড়ের এই মিলনজাত আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দের মধ্যে জন্মেছে মানুষ, আর বেঁচেও রয়েছে তারই মধ্যে এবং লয়ও পাবে সেই আনন্দ সাগরেই।

উপনিষদের কথাও তাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ থেকে দুটি মন্ত্র উদ্ধৃত করছি।

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।"
"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।"

তাই বৈদিক ও তান্ত্রিক এ দুটি ধারাই এসে মিশেছে একই সাগরে। যে পথেই মানুষ যাক না কেন তাদের গন্তব্যস্থল একই।]

এই আনন্দের অবস্থান সাধকের শরীরেই। স্থূলবস্তুর মধ্যে মদই এই আনন্দের কল্পনায় সহায়ক ; মদ্যপানে মনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে, অন্তত ক্ষণিকের তরেও, একটা বিস্মৃতি-ভিত্তিক তৃপ্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। তাই যোগীরা কারণ পান করেন। [জীবের জন্ম হয়েছে ব্রহ্মে বা আনন্দে ; শাস্ত্রমতে কারণবারি থেকে। তাই ব্রহ্ম, আনন্দ ও কারণবারি সমার্থক।]

যে যোগী পাপ ও পুণ্যরূপ পশুকে জ্ঞানের খড়্গ দিয়ে ছিন্ন করে ফেলে ব্রহ্মধ্যানে সমাহিত হতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মাংসাশী। [মতান্তরে, যে যোগী বহির্গামী ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্গামী

করে ব্রহ্মের সঙ্গে পূর্ণসংযোগ সাধন করতে পারেন, তিনিই মাংসাশী।]

আর, যিনি পরমাশক্তির সঙ্গে পরমশিবকে মিলিত করতে পারেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই প্রকৃত মৈথুনরত। যারা মৈথুনকে স্ত্রীসহবাস বলে মনে করে তারা স্ত্রীসেবক মাত্র।

এই হল কৌলমতে পঞ্চ ম-কার সাধনার ভাবাদর্শ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে—বিশেষতঃ পঞ্চ ম-কার-সাধনে অধিকারিভেদ শাস্ত্রে সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। এ সাধনা বা চরম পরীক্ষা ছিল গুটিকতক দিব্য সাধকের জন্য, তন্ত্রসাধনার শেষধাপে। কেবল নির্বিকারচিত্ত কৌল সাধকের জন্যই ছিল মন্ত্রপূত পঞ্চ ম-কারের ব্যবস্থা। হয়ত গুরুর আদেশে স্থূল পার্থিব বস্তুগুলি, অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও নারী নিয়েই হত এই সাধনা। কেউ কেউ এ সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, এই-সব পার্থিব বস্তুগুলি মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটায়; এরা আধ্যাত্মিকতার পথের কাঁটা। তাই এ-সব প্রলোভনের জিনিসগুলি দিয়েই হয় সাধকের পরীক্ষা। পঞ্চোপচার ভোগের পরেও যে সাধক রাগদ্বেষবর্জিত হয়ে মন্ত্র-জপ করেন, তন্ত্রমতে তিনিই কৌলিক। পার্থিব ভোগ্য-বস্তুগুলির মধ্যে পঞ্চ ম-কারের আকর্ষণ প্রবল, অন্তত সে কালে যে তা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে আকর্ষণ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ অর্থাৎ তার প্রকৃতির মধ্যেই তা জন্মেছে। তার জন্ম-বীজেই রয়েছে সে বিষ। সে বিষকে নির্মূল করতে হলে তা করতে হবে বিষ দিয়েই; 'বিষস্য বিষমৌষধম্'। কিন্তু বাইরের এ প্রতিষেধক বিষ ব্যবহার করতে হবে একমাত্র গুরুর নির্দেশে। এ বিষের অপব্যবহার হলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য অর্থাৎ সাধকের পতন অবশ্যম্ভাবী।

কারো কারো মতে এই পঞ্চোপচার ছাড়া শক্তিপূজা অসার্থক।

এরা শক্তিপূজার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। শক্তিপূজা, অন্যান্য পূজার মত ধ্যান জগতের পূজা নয়; পরাশক্তির স্পষ্টতম প্রকাশ এই দৃশ্যমান জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের পূজা। কাজেই সে পূজায় চাই সকল রকম পার্থিব উপচার। যে পূজার সংকল্প মানুষের পার্থিব জীবনের নানাপ্রকার সমৃদ্ধি, তাতে তো পার্থিব সর্বপ্রকার কাম্যবস্তুর সমাবেশ চাই-ই। নইলে সে পূজা সার্থক হবে কেন?

মদ শক্তির প্রতীক। আসবপানে মানুষের রজোগুণ বাড়ে—নিজের বলবীর্য-সম্পর্কে ধারণা উচ্চগামী হয়। কাজেই এ পূজার উপচার মদ। মাংস ও মৎস্য সমগ্র বিশ্বের ভূচর ও জলচর প্রাণীর অভিব্যঞ্জক [খেচরকেও ভূতলে নামতে হয়]; তাই সে উপচারও প্রয়োজন। বিশ্বের যাবতীয় উদ্ভিদের বা ফসলের প্রতিনিধিত্ব করে মুদ্রা। আর মৈথুনে রয়েছে প্রকৃতি সৃষ্টিসুখের আস্বাদ—এতে ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের হয়েছে একত্র সমাবেশ। সৃষ্টির আনন্দই পরমানন্দের স্বরূপ। মাতৃকাভেদ তন্ত্রমতে "যদ্রূপং পরমানন্দং তন্নাস্তি ভুবনত্রয়ে।" অর্থাৎ এর মত আনন্দ আর ত্রিভুবনে নেই। বিশ্বজগতের চিরচঞ্চল প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে তাল মিলিয়েই বিশ্বমাতার পূজা করতে হয়। এ পূজায় কোনো কিছুই বাদ দিলে চলে না।

তা যে কারণেই হোক, একদা যে স্থূল পঞ্চ ম-কার সাধনা তান্ত্রিক সাধনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তন্ত্রশাস্ত্রের বা তান্ত্রিক ধর্মের কোনো খবর না রেখেও পঞ্চ ম-কার সাধনাকে সবাই তন্ত্রসাধনা বলে গণ্য করত। তন্ত্রের এ অধোগতির জন্য দায়ী যত অনধিকারীর দল, পাশবদ্ধ সাধারণ দক্ষিণাচারী মানুষ। তাদের কাছে এ সাধনা অতি অপরূপ হয়েই দেখা দিল; আর তা দেবেই বা না কেন? যা ছিল মুষ্টিমেয় দিব্য সাধকের গূঢ় ধর্ম তা হল সাধারণ্য বা সাধারণের ধর্ম। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ ম-কারের অর্থও গেল বদলে; তন্ত্রের সর্বদেহে পড়ল দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ।

তাই তন্ত্রশাস্ত্র কামশাস্ত্রের নবসংস্করণ বলে বিশ্বনিন্দিত হয়ে উঠল।

অথচ, তন্ত্র সাধনার বিরাট আশ্রমের এক অতি নিভৃত কোণে ছিল পঞ্চ ম-কার সাধনার একটি নিতান্ত ছোট ঘর। সে ঘরের চাবি থাকত স্বয়ং গুরুর কাছে। সাধারণ সাধকের পক্ষে সে ঘরের আশপাশেও যাওয়া সম্ভবপর ছিল না, লতা-সাধনার নামও তারা করতে পারত না; এমনি ছিল কড়াকড়ি। কিন্তু সহসা কোথায় গেল সে বিধি-নিষেধ; জোয়ারের জলের মত এসে সে নিরালা ঘরে ঢুকল সাধারণজন। গুরুর গৌরব গেল, সাধকের অপমৃত্যু ঘটল। তারপর তন্ত্রসাধনার তরীতে উঠল তিনটি পাল: ষট্‌কর্ম, অষ্টসিদ্ধি ও পঞ্চ ম-কার সাধনা। তরী তরতর করে ছুটল জাহান্নমের পথে।

এই অধোগতির অবশ্য নজির রয়েছে। মহাযানী বৌদ্ধধর্ম যে বজ্রযান-সহজযানে পরিণত হবে তা কে ভেবেছিল?

তা যাই হোক, অশুচি পঞ্চ ম-কার সাধনাকে শুদ্ধ করা হল বৈদিক মন্ত্রে আর বামদেব উপাসনার সমার্থক করে। সে কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

কিন্তু যোগ্য গুরুরা তখনো হাল ছাড়েন নি। তাঁরা মেনে নিলেন যে পশুরাও অর্থাৎ পাশবদ্ধ জীবেরাও এ সাধনা করতে পারে, তবে তাদের জন্য পঞ্চ ম-কারের পঞ্চতত্ত্বের স্থলে বিহিত করলেন অনুকল্পতত্ত্ব।

অনুকল্পতত্ত্বের স্বরূপ কি? মদ্য, মাংস ইত্যাদির বদলে অনুরূপ কোনো দ্রব্যের প্রবর্তন। সেগুলি যথাক্রমে—

মদের বদলে নারিকেলের জল বা দুধ।

মাংসের বদলে নুন, আদা, তিল, যব বা পেঁয়াজ।

মৎস্যের বদলে বেগুন, মুলা বা পানিফল।

মুদ্রার বদলে ধান, চাল, গম অথবা কোনো বিশেষ ভঙ্গীতে (মুদ্রায়) পুষ্পাঞ্জলি।

মৈথুনের বদলে এক বিশেষ প্রকারে কোনো বিশেষ ফুলের মালা গেঁথে দেবতার পূজা করা।

অনুকল্প বা গৌণবিধির বিধান তো হল, কিন্তু তা মানবে কে? যে বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে সে কি আর মানুষ না খেয়ে পারে? কাজেই এ অনুকল্পতত্ত্ব বস্তাবন্দী হয়ে পচতে লাগল আর পঞ্চ ম-কার সাধনার মদ্যমাংসের নরকের আসর সারা দেশে গুলজার হয়ে উঠল।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে সারা পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল এ-সব তথাকথিত তান্ত্রিক সাধকের দল। দেশে তখন সাধু বলতেই বোঝা যেত তান্ত্রিক সাধু। তুক্‌তাকের ফলে তাদের শিষ্য-সেবক জুটতে একটুও দেরি হল না। বহু ভৈরবী, মহাভৈরবী, পরাশক্তির সৃষ্টি হল; তান্ত্রিকবাদ এ মাটিতে শেকড় গেড়ে বসল। এই-সব সাধুদের আস্তানা দখল করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে এসে জুড়ে বসল সুফী-দরবেশের দল—তাঁদের মসজিদ, দরগা ও খান্‌কা সাজিয়ে। এর ফলে তারা শুধু তৈরী-করা আস্তানাই পেল না, ক্রমে ক্রমে বিতাড়িত তান্ত্রিকের পুরানো চেলারাও এসে সেখানে জুটল। মুসলমান ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হল, বিশেষ করে বাঙলায় তান্ত্রিক সাধুদেরই রচিত আসরে।

চতুর্দশ শতকে কালীপূজার বহুল প্রচলনের ফলে তান্ত্রিকতার ভিত্তি হল আরো সুপ্রতিষ্ঠিত। গৃহস্থেরাও কালী কালী বলে, গেরুয়া ও রুদ্রাক্ষের মালা পরে, তান্ত্রিক সাধকরূপে মদ্যমাংসের সঙ্গে পরকীয়া শক্তির আরাধনায় মন দিল। সারা দেশে হল তন্ত্রের রাজত্ব; সে অশুভ রাজগির শেষ হয়েছে মোটামুটি ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে।

এবার বিচার করে দেখা যাক তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান, বিশেষত পঞ্চ ম-কারের মধ্য দিয়ে কি কি তথ্য পাওয়া গেল।

সাধকভেদে যে আচারগত প্রভেদ রয়েছে তার কাহিনী আমাদের আলোচনায় স্থান পায়নি, পেয়েছে সে-সব আচারই যা তান্ত্রিক জগতের সাধারণ সম্পত্তি। অর্থাৎ তন্ত্র বা তান্ত্রিক বলতে যে-সব তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের কথা আমাদের মনে পড়ে।

তন্ত্র জগতের ছাড়পত্র দীক্ষা। দীক্ষা না হলে তান্ত্রিক কর্মে অধিকার জন্মে না। দীক্ষাই পরম জ্ঞানের হেতু ও 'পাশমুক্তি'র প্রথম সোপান। দীক্ষাদান করেন গুরু, সাধকের তন্ত্রসাধনার যোগ্যতা বিচার করে। গুরুই এ জগতে একমাত্র পথপ্রদর্শক। তান্ত্রিক সাধক কখনো গুরুহীন হতে পারে না। মোটামুটি দীক্ষা অর্থ ইষ্টমন্ত্র দান; দীক্ষায় শুভক্ষণ বিচার করতে হয়। দীক্ষাগুরু নারীও হতে পারেন; এতে শাস্ত্রীয় কোনো বাধা নেই। নিজের জননী গুরু হলে সে দীক্ষায় সাধকের ফললাভ হয় আটগুণ।

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে দীক্ষা সাত প্রকারের। নানা তন্ত্রে আরো এর অনেক প্রকার-ভেদ রয়েছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বামীজী বিবেকানন্দকে স্পর্শ-দীক্ষা দিয়েছিলেন।

দীক্ষার পরে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও শূদ্রের শূদ্রত্ব দুই-ই লোপ পায়। তন্ত্রজগতে পূর্ণসাম্যের রাজত্ব: সেখানে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে কোনো ভেদ নেই।

সধবা নারী দীক্ষিত হতে পারেন স্বামীর অনুমতি নিয়ে, বিধবা পুত্রের, আর কন্যা পিতার।

দীক্ষার পরে তন্ত্রপথে যাত্রার প্রথম ধাপে হয় অভিষেক বা মন্ত্রপূত জলে স্নান। দীক্ষার মত অভিষেকেরও কর্মকর্তা গুরু। তন্ত্রের পথে চলতে চলতে সাধকের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার নানাপ্রকার অভিষেক হয়; সবই গুরুর নির্দেশে।

তান্ত্রিক কর্মবিধি দ্বিবিধ: নিত্য ও নৈমিত্তিক।

বৈদিক গায়ত্রীর মত তান্ত্রিক গায়ত্রীও রয়েছে। উপনয়নের পরে জন্মে বৈদিক সন্ধ্যার অধিকার, দীক্ষার পরে জন্মে তান্ত্রিক

সন্ধ্যার। তন্ত্রের মন্ত্র আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন, কতগুলি শব্দসমষ্টি। এতে 'জাঙ্গুলী' ভাষার প্রভাব রয়েছে। মন্ত্রেরও লিঙ্গভেদ বর্তমান : পুং, স্ত্রী ও ক্লীব।

বৈদিক ও তান্ত্রিক গায়ত্রীর মধ্যে বিভেদ প্রবল। ব্রাহ্মণেরা তান্ত্রিক গায়ত্রীর পূর্বে বৈদিক গায়ত্রী পাঠ করতে পারেন বটে, কিন্তু সকলের পক্ষেই দীক্ষা বা ইষ্টমন্ত্র সর্বাপেক্ষা পবিত্র মন্ত্র।

পুরশ্চরণ কাকে বলে ? পুরশ্চরণ মন্ত্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রথমেই করণীয় কর্ম। পুরশ্চরণ পাঁচটি নিত্যকর্মের সমষ্টি : নিত্যপূজা, ইষ্টমন্ত্র জপ, তর্পণ, হোম ও ব্রাহ্মণভোজন। একমাত্র ইষ্টমন্ত্র জপ করেও পুরশ্চরণের ফললাভ ঘটে।

ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার কোন্ কোন্ উপচারের সমষ্টি ? পঞ্চগব্যই বা কাকে বলে ?

এর পরে এসেছে ভৈরবীচক্রের কথা : আনন্দ ভৈরব ও আনন্দ ভৈরবীর মূর্তিকল্পনা। শবসাধনা সকলের কাছেই তান্ত্রিক জগতের একটি বিভীষিকার চিত্র ; আমরা এখানে সে জগতের রূপনির্দেশ করতে চেষ্টা করেছি।

তারপর পেয়েছি ষট্‌কর্ম ও অষ্টসিদ্ধির কিছু কিছু সন্ধান। অবশ্য সে সন্ধানটুকু সম্বল করে আমরা যে তান্ত্রিক ধর্ম বা ভাবাদর্শের বিশেষ সন্ধান পেয়েছি, একথা মনে করলে আমাদের নিরাশ হতে হবে। কারণ, ষট্‌কর্ম বা অষ্টসিদ্ধি কোনোটিই তন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি, শুধু করেছে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি।

ষট্‌চক্রভেদ, মূলাধার, অনাহতপদ্ম ও কুলকুণ্ডলিনী শক্তির অর্থ কি? শিবচক্র বা সহস্রদলপদ্ম কাকে বলে? সেকথা আমরা জেনেছি।

তারপর এসেছে পঞ্চ ম-কার সাধনার কথা। পঞ্চ ম-কার কি কি ? মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। একমাত্র দিব্যাচারী বা কৌলরাই এ সাধনার অধিকারী। কৌলদের মতে এই পাঁচটি স্থূলবস্তু কোন্ কোন্ সূক্ষ্মবস্তুর প্রতীক ?

এ সাধনা কৌলদের চরম পরীক্ষা; এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সাধক হন পরমহংস।

কারো কারো মতে এই পঞ্চোপচার ছাড়া শক্তিপূজা অসার্থক। শক্তিপূজা ধ্যানজগতের পূজা নয়; পরাশক্তির স্পষ্টতম প্রকাশ এই দৃশ্যমান জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের পূজা। এ পূজার সংকল্প মানবের সর্বপ্রকার পার্থিব কামনার বস্তু। কাজেই সে পূজার উপকরণ হবে সর্বপ্রকার পার্থিব সামগ্রী। মদ্য, মাংস ইত্যাদি জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের অংশ কোন্ কোন্ জিনিসের প্রতীক?

অনধিকারী সাধকদের অর্থাৎ দক্ষিণাচারী পশুধর্মী সাধকদের হাতে পড়ে পঞ্চ ম-কার সাধনা তার মর্যাদা হারিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রের সর্ব অঙ্গে পড়েছে কলঙ্কের চিহ্ন। তন্ত্রশাস্ত্র তাই কামশাস্ত্রের নবসংস্করণ বলে নিন্দিত হয়েছে।

অনধিকারী সাধকদের জন্য পঞ্চ ম-কারের অনুকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে বটে, কিন্তু সে অনুকল্পের বিধান পুঁথিগতই হয়ে রয়েছে। অনধিকারী তথাকথিত তান্ত্রিক কি আর সে কথা মানে? মদ্য-মাংসে যার রুচি জন্মেছে সে কি আর দুধ ও আদা খেয়ে তৃপ্ত হয়?

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে পূর্বাঞ্চলে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান ও সাধন-পদ্ধতির যে বিরাট আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল, বিশেষ করে বাঙলায়, তার মোটামুটি শেষ হয়েছে উনবিংশ শতকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তন্ত্রের দেবদেবী

দেবতা যে মানুষ সৃষ্টি করেছে এ কথা সকলে মেনে নাও নিতে পারেন, তবে মানুষই যে দেবতা সৃষ্টি করেছে এ তথ্য সম্পর্কে মতদ্বৈধ হবার কথা নয়। দেবতা মানুষের মূর্ত-কল্পনা। দেবতার সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মনের ভয়, বিস্ময় ও ভক্তি থেকে অর্থাৎ তার মনের স্বভাবজ চিন্তাসূত্রে কিন্তু প্রতিযোগিতার ফলেও যে নব নব দেবতার সৃষ্টি হতে পারে তা প্রমাণ করেছে বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র।

বজ্রযানের আমলেই এ প্রতিযোগিতা প্রবলতম হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে আমল ছিল মোটামুটি দশম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত। এর প্রধান কারণ সেকালের বাঙলার অপূর্ব ভাস্কর্য ও শিল্প। বজ্রযানের দেবতাদের মূর্তকল্পনা পাথরে ও ধাতুতে যে পরম সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা কদাচিৎ মেলে। এ সৌন্দর্যের কিছু কিছু নিদর্শন এখনো বাঙলার কলকাতা, ঢাকা, রাজসাহী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎএর যাদুঘরে রয়েছে; আর রয়েছে বিক্রমপুরে, দিনাজপুরে ও কুমিল্লায়।

সৌন্দর্যের এমন মূর্ত নিদর্শনগুলি গড়ে ওঠার ফলে হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে বজ্রযান এগিয়ে চলছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, এর ফলে যে বৌদ্ধতন্ত্রের দিকে সাধারণ মানুষ বেশি ঝুঁকে পড়েছিল আর বৌদ্ধবিহারে যে বেশি ভক্তের সমাবেশ হত তার কথা সমকালীন পুঁথিতে রয়েছে। শূন্য বা অমূর্ত দেবতার এমন মনোরম মূর্ত কল্পনার যে উদ্ভট সাফাই গাওয়া হত তার কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করেছি। এর প্রমাণ রয়েছে অদ্বয়বজ্র সংহিতায়; পুঁথিখানি দশম শতকের। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, জৈনধর্মীদের মুখেও সেই

একই সাফাই। তাঁদের তীর্থঙ্করদের মূর্তিগুলি অমূর্তেরই স্মারক-চিহ্ন। কিন্তু যক্ষ-যক্ষিণীগুলি কি ? এ সম্পর্কে তাঁরা অবশ্য নিরুত্তর।

নতুন নতুন দেবতার পরিকল্পনায় বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে এই পাল্লা দেওয়া চলেছিল বহুদিন ধরে। যদি কোনো বৌদ্ধবিহারের পাশাপাশি সেই যুগে কোনো হিন্দু মন্দির থাকত, আর এমন একদল ভক্ত থাকত যাদের যাতায়াত রয়েছে এ দুটি দেবস্থানেই, তবে নিতাই তাদের তাক লাগবার কথা। আজ যে দেবতাকে দেখা গেল হিন্দু মন্দিরে, তাঁকেই কাল দেখা গেল বৌদ্ধবিহারে, হয়ত অন্য পোশাকে ও বৃত্তিগত বিভিন্নতার মধ্যে। আবার পরের দিন হয়ত বৌদ্ধমূর্তির অশোভন বৃত্তির কাহিনী প্রকাশ পেল হিন্দু-মন্দিরে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে দেবতার এমন অদল বদল হয়েছে বহুবার। কাজেই, বৌদ্ধদেবতাদের মধ্যে রয়েছে হিন্দুত্বের ছাপ আবার হিন্দু দেবতাদের কারো কারো মধ্যে আবিষ্কার হয় বৌদ্ধ প্রেরণা।

বৌদ্ধ দেবদেবীর কথা এখন পুরাবৃত্তের আওতায়। সে দেবতাদের এখন আর বিশেষ কোনো সন্ধান মেলে না, তাই আর তাঁরা সাধারণজনের কাছে জীয়ন্ত নন। হিন্দুদেবদেবীরা আমাদের কাছে জাগ্রত ; তাঁদের মূর্তিগুলিও আমাদের পরিচিত। আমাদের গৃহস্থালী ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে তাঁদের স্থানও বিশিষ্ট। কাজেই, বৌদ্ধ দেবদেবীর সম্পর্কে আমরা যা বলব তার চেয়ে বেশি বলব এ-সব চিরপরিচিত হিন্দু দেবদেবীদের সম্পর্কে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষুদ্র আলোচনার মধ্যে সকল দেবদেবীর কথা বলা সম্ভবপর নয়। একটি অধ্যায়ের মধ্যে একখানা পুরা পুঁথির তথ্য তো শেষ করা যায় না !

বৌদ্ধ দেবদেবীদের কথা দিয়ে শুরু করা যাক।

'তারা' বৌদ্ধতন্ত্রের নামজাদা দেবী। এঁকে বোধিসত্ত্ব অব-লোকিতেশ্বরের পত্নী বলে বলা হয়। এঁর অপর নাম অষ্টমহাভয়

তারা। কোন্ কোন্ মহাভয় ইনি দূর করেন? অগ্নিভয়, দস্যুভয়, বন্ধনভয়, মজ্জনভয় অর্থাৎ জলে ডোবার ভয় ইত্যাদি, এমন কি সর্পভয়ও। এ-সব ভয় সেকালে ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অতিশয় প্রত্যক্ষ ও সম্ভাব্য।

তারাদেবীকে আবার মৃত্যুবঞ্চনা তারাও বলা হত। তারাদেবীর পূজকের মৃত্যু নেই—তিনি অমর। তাঁর নিজের তো বটেই, এমন কি তাঁর পূজকেরও এত দাপট যে হিন্দুদের কোনো দেবতাই তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। এমন যে তারা দেবী, তাঁকে না মেনে কে পারে?

হিন্দুরা এখন তারাদেবীকে দশমহাবিদ্যার মধ্যে স্থান দিয়ে আত্মসাৎ করেছে। শাক্তেরা বলে, তারা 'ব্রহ্মময়ী'। হয়ত এ-সব থেকেই প্রসিদ্ধ শাস্ত্রকার নীলকণ্ঠ বলেছেন, শক্তিপূজা মায়ার আবরণে ঘেরা ব্রহ্মেরই পূজা।

আবার আমরা তারাদেবীর দর্শন পাব দশমহাবিদ্যার কথায়।

বজ্রযানের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় দেবতা লোকেশ্বর বা অবলোকিতেশ্বর। ইনি বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ ইনি তখনো বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ লাভ করেন নি; ঠিক তার পূর্বাবস্থায় পৌঁছেছেন।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে উপনিষদের কাল থেকে হিন্দুরা দেবত্ব-সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেছে, বৌদ্ধেরাও সে মতেরই সমর্থক। এর কারণ, তাদের দেবদেবী তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হিন্দু দেবদেবীর প্রতিচ্ছায়া।

সে মতটি কি? তা হল, দেবত্ব ক্ষণস্থায়ী; চিরস্থায়ী নয়, ব্রহ্মত্ব নয়। দেবতাদের শক্তির তারতম্য রয়েছে, আর রয়েছে তাঁদের স্থানচ্যুতি ও পতনের সম্ভাবনা।

দেবতাদের মধ্যে হেরুকাও সুপ্রসিদ্ধ।

কতগুলি দেবী অমূর্তভাবের প্রতীক। যেমন, একজটা, নৈরাত্মা প্রভৃতি।

. মরীচি চলেন রথে ; সে রথ টানে সাতটি বরাহ বা শূকর—মার্তণ্ডের রথের মত সপ্তাশ্ব নয়। মরীচির দোর্দণ্ড প্রতাপ ; সকল হিন্দুদেবতাই তাঁর স্তুতি করেন।

মরীচিকে হিন্দুর সূর্যদেবতার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতেই এক বলা চলে। নামের সঙ্গেও মিল বের করা হয়ত অসম্ভব নয়। রামায়ণের বিখ্যাত স্বর্ণমৃগ হল মারীচ রাক্ষসের মায়ারূপ। মরীচিপুত্র কশ্যপ। আবার বহুপরিচিত সূর্যপ্রণামে রয়েছে 'কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং'। কিন্তু এ-সব তথ্য জোড়াতাড়া দেওয়া আমাদের কাজ নয়।

ষট্‌কর্মের এককর্ম বশীকরণের অধিষ্ঠাত্রীদেবী কুরুকুল্লা। বিক্রমপুরের 'বজ্রযোগিনী' এখন 'ছিন্নমস্তা' নামে হিন্দুর দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।

গণপতি বা গণেশ বৈদিক দেবগোষ্ঠীর। ইনি হিন্দুর পঞ্চোপাসকদের মধ্যে একটি পরম আরাধ্য দেবতা। গণপতি এখনো হিন্দুর বাড়ীতে, বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে, সর্বসিদ্ধিদাতা বলে পূজিত। এঁকে বৌদ্ধ দেবসভায় আসন দেওয়া হয়েছে শুধু অবমাননা করার জন্য, সম্মাননার জন্য নয়। সে কথা অন্যত্র বলা হয়েছে।

বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবসভার বিবরণ দাখিল করে কিছু কিছু মনোরঞ্জক গল্প সৃষ্টি করা চলে বটে, কিন্তু তা সাধারণজনের কাছে স্পষ্ট হবে না ; কারণ বৌদ্ধ দেবসভা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে সে-সব দেবতারা শূন্যে বিলীন হয়েছেন বহুকাল পূর্বে। তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য স্থান পেয়েছেন হিন্দু দেবসভায়, যদিও ভিন্নরূপে। প্রথম যুগে এই দেবতাদের পরিকল্পনায় বৌদ্ধপ্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালে সে প্রভাবের চিহ্নমাত্র নেই।

পুরাবৃত্তের পাতা থেকে বৌদ্ধদের দেবদেবীর আকার, প্রকার, কার্যকলাপ ইত্যাদি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন এখানে নেই। আমরা তাই এখন তান্ত্রিক দেবদেবীদের মধ্যে যাঁরা আমাদের বহু পরিচিত, তাঁদের কাহিনী শুরু করব।

এঁদের মধ্যে পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে বাঙলায়, যিনি সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও ভয়ঙ্কর হয়েও নিতান্ত আপনজন বলে গণ্য, তিনি হলেন দেবী কালিকা। কলকাতার কালীঘাটের কালী ভারতবিখ্যাত দেবী। রক্ষাকর্ত্রীরূপে তাঁর মাহাত্ম্য অতুলনীয়। সারা ভারতবর্ষে এমন কোনো স্থান নেই যেখান থেকে তীর্থযাত্রীরা এখানে এসে কালীদর্শন করে তাঁর কাছে নিজ নিজ প্রার্থনা জানায় না। সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ইষ্টদেবী দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীও বহুবিশ্রুত।

দেবী কালিকার প্রথম পরিকল্পনা বৌদ্ধদের, না ভারতবষের আদিবাসীদের মধ্যে হয়েছিল, তা নিয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে। কিন্তু ইনি যে হিন্দুর ঘরে জন্মান নি সে তথ্য স্পষ্ট। কারণ দেবী কালিকা মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীরই রোষ-সংস্করণ অর্থাৎ চণ্ডীদেবীর ক্রোধজাত নবরূপ। কিন্তু চণ্ডীদেবী নিজেই তো বিন্ধ্যবাসিনী শবরী—ভারতবর্ষের আদিবাসী শবর জাতির ইষ্টদেবতা। এ কথা আরো বিশদ করে বলা যাবে চণ্ডী-কাহিনীতে অর্থাৎ দেবী দুর্গার কথায়।

মহাযানী বৌদ্ধেরা স্বীকার করেন যে শবরীকে তারা পেয়েছেন শবরদের গৃহেই, কিন্তু তিনি দুজন ধ্যানী বুদ্ধজাত—এঁদের একজন অক্ষোভ্য, অন্যজন অমোঘসিদ্ধি।

কিন্তু বৌদ্ধদের দাবি এখানেই মেটেনি। আরো কিছু বাকি রয়েছে।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত একখানা নামজাদা প্রামাণিক পুঁথি। অশ্বঘোষের কাল প্রথম শতক অর্থাৎ বুদ্ধদেবের তিরোধানের পাঁচ বা ছয় শ' বছর পরে। এ পুঁথিখানা চীনাভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। সে অনুবাদে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয়, ভগবান বুদ্ধের কালী-দর্শন ঘটেছিল, তবে সেখানে তাঁর কার্যকলাপ ছিল ভিন্নতর। সে কালীদর্শনের চিত্রটি এরূপ :

ভগবান বুদ্ধ ধ্যানে বসেছেন নির্বাণ বা বুদ্ধত্বলাভের জন্য 'বোধি-দ্রুমে'র নিচে। তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য এল 'মার' অর্থাৎ যে দেবতা এ-সব কাজে পটু। ['মার'-এর আভিধানিক অর্থ কামদেবও বটে।] সঙ্গে নিয়ে এল একজন নারী ; তার নাম 'মা-কিয়া-কালী' [হয়ত, মেঘকালী বা মহাকালী] ; মহাকালীর হাতে খর্পর অর্থাৎ মাথার খুলি। তিনি এসে দাঁড়ালেন ঠিক বোধিসত্ত্বের সম্মুখে ; দাঁড়িয়ে নানা ছলাকলা দিয়ে তাকে কামমোহিত করতে চেষ্টা করলেন।

এ চেষ্টায় নিষ্ফল হয়েই মার তার সাঙ্গোপাঙ্গকে 'ত্রিশূলাদি' দিয়ে বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করতে অনুমতি দেন।

অর্থাৎ মহাকালীর কার্যকলাপ এখানে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা পর্যায়ের। তা যাই হোক, বিদ্বজ্জনের অনুমান, ত্রিশূলধারী শিব ও খর্পরধারিণী শিবশক্তি বা কালী অশ্বঘোষের কালে সুপরিচিত ছিলেন। বৌদ্ধতন্ত্রই হয়ত কালীকে স্থায়ী আসন দিয়েছে। বৌদ্ধদের হাতে পড়ে, মহাকালী বা কালীই পরিগ্রহ করেছেন 'তারা' রূপ ; পরে শাক্তের দলে ভিড়ে 'তারা' হলেন ব্রহ্মময়ী।

এ-সব রহস্য সমাধানের ভার অভিজ্ঞদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা দেবী কালিকার আখ্যানে মনোনিবেশ করছি।

বাঙলায় ও বাঙলার বাইরে বহুস্থানে দেবী কালিকার পূজা হয় বিভিন্ন নামে। কিন্তু যে নামেই তাঁর মূর্তি গড়া হোক না কেন, সবই হয় ভয়ঙ্করী, বিভীষিকাময়ী। দেবী কালিকা সর্বত্রই ধ্বংসের বা প্রলয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এঁর মূর্তি গড়া হয় মাটি, পাথর বা কোনো ধাতু দিয়ে। নিত্যপূজার জন্য দেবী স্থাপিত হন মন্দিরে আর কুলপূজা ও মানত পূজা হয় বৃক্ষতলে, নাটমন্দিরে বা সাময়িক পটাবাসে।

যে যে বিভিন্নরূপে ও নামে দেবী কালিকার পূজা হয় তার একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া যাচ্ছে :

(১) দক্ষিণাকালী, (২) সিদ্ধকালী, (৩) গুহ্যকালী, (৪) ভদ্রকালী, (৫) শ্মশানকালী, (৬) রক্ষাকালী, মহাকালী,* (৭) দেওয়ালী (৮) রটন্তী, (৯) ফলাহারিণী কালী।

এঁদের মধ্যে বর ও অভয়দায়িনী বলে দক্ষিণাকালীই সর্বাধিক জনপ্রিয়। কেউ বলেন, ইনি এঁর ডান পা আগে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বলে এঁকে 'দক্ষিণা' বলা হয়; কেউ বলেন ইনি কল্যাণময়ী অনুকূল ও দাক্ষিণ্যযুক্ত বলে এই নাম হয়েছে।

ইনি ভীষণ দর্শনা; দেখে দেখে আমরা নিতান্ত অভ্যস্ত বলে আমাদের কাছে তাঁর এ ভয়ঙ্করী মূর্তি তত প্রকট হয় না বটে, কিন্তু যারাই এ মূর্তি প্রথম দেখবেন, তাঁরা সবাই নিশ্চয়ই ভাববেন, দেবতার একি বিকট রূপ! ভুললে চলবে না, কালী বিশ্বপ্রকৃতির সংহার-মূর্তি; ভূমিকম্প, প্রবল ঝড়, বা মহামারীর মতই প্রলয়ঙ্কর।

এঁর রং দুর্যোগের মেঘের মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। গলায় নরমুণ্ডমালা, দেহের অন্যত্রও এই একই অলঙ্কার; শবের অঙ্গবিশেষ তাঁর কর্ণাভরণ, তাঁর মেখলা বা কোমরের অলঙ্কার মৃতদেহের হাত দিয়ে তৈরী।

এঁর চারটি হাত; দুটি ডান, দুটি বাঁ। দুটি বাঁ হাতের একটিতে সদ্যোহত মানুষের মাথা, অন্যটিতে রক্তাক্ত খড়্গ। দুটি ডান হাতের একটির ভঙ্গী বরদানের অন্যটির অভয় দানের।

এঁর মুখের দুদিক থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে; মনে হয় যেন এখনই রক্তপান করে উঠলেন! ইনি শ্মশানবাসিনী; এঁর তিনটি চোখ—তা এত উজ্জ্বল যে তার সঙ্গে তুলনা চলে মাত্র নবোদিত সূর্যের। ইনি করাল-বদনা ও দন্তুরা অর্থাৎ প্রকাণ্ড ও বিকট তাঁর দাঁত। স্তনদ্বয় উন্নত ও নিতান্ত স্থূল। ইনি বিবসনা; মহাকাল বা শিবের

---

* এই ছয়টির পরে উগ্রকালী ও চামুণ্ডাকালীর উল্লেখসহ অষ্টবিধ কালী-মূর্তির পূজা একাধিক তন্ত্রে বিহিত হয়েছে।

শব দেহের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চারদিকে চিৎকারের ভঙ্গীতে মুখ ব্যাদান করে রয়েছে অসংখ্য শিবা বা শৃগালী।

এই ভয়ঙ্করী মূর্তিতেই তিনি আমাদের মানসপটে গেঁথে রয়েছেন। অথচ এই ভীমা সংহার-মূর্তিতেই তিনি সারা পূর্বাঞ্চলে সর্বাপেক্ষা কল্যাণময়ী দেবতা বলে পূজিত।

কিন্তু যে রূপে আমরা এখন তাঁর পূজা করি, সেটি তাঁর আদিম রূপ নয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে তাঁর যে রূপ বর্ণনা রয়েছে তার সঙ্গে আধুনিক রূপের গরমিল। কি সে আদিম রূপ?

চণ্ড ও মুণ্ড এই দুটি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে দেবী চণ্ডীর মুখ হল রোষে রক্তবর্ণ ও ভ্রূকুটি-কুটিল।* তাঁর ললাট অর্থাৎ কপাল থেকে বেরিয়ে এল এক মহাশক্তি—ইনিই কালী। হাতে তাঁর খড়্গ, পাশ ও গদা। পরনে তাঁর বাঘের চামড়া আর গলায় অলঙ্কাররূপে নর-মুণ্ডের মালা। চোখ তাঁর রক্তবর্ণ ও কোটরগত, জিহ্বা তাঁর লোল, লক্‌লকে অর্থাৎ এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে। তাঁর অট্টহাসি চারদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরবর্তীকালে রচিত কালিকা পুরাণের মতে দেবী দুর্গা বা সতীই পরজন্মে কালীরূপে শিবশক্তি হয়েছিলেন।

এটা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত যে দেবী কালিকার এই আধুনিক রূপ সৃষ্টি করেছেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। এ রূপটি তাঁর ধ্যানলব্ধ বলে কথিত। এঁর কাল মোটামুটি পঞ্চদশ শতকের চতুর্থ পাদ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত; অনেকে বলেন, ১৪৮৫ থেকে

*ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন তস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদা॥
ভ্রূকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতং।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিধারিণী॥
—মার্কণ্ডেয়পুরাণ

১৫৩৩। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চারশো বছর ধরে দেবী কালিকার এই আধুনিক রূপের ধ্যান আমরা করছি।

আগমবাগীশের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তন্ত্রসার'; এতে তিনি এই অতল তন্ত্রসাগর খুঁজে খুঁজে ডুবুরীর মত নানা মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। তন্ত্রসার একখানি অতি মূল্যবান প্রামাণিক পুঁথি; তান্ত্রিকের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয়।

এই পুঁথিতে 'কালীতন্ত্রে'র উল্লেখ করে আগমবাগীশ দেবী কালিকার এই আধুনিক রূপের কথাই উল্লেখ করেছেন। "করালবদনাং ঘোরাং···চতুর্ভুজাং, মুণ্ডমালা বিভূষিতাং, মহামেঘ-প্রভাং শ্যামাং, পীনোন্নত পয়োধরাং, শ্মশানালয়বাসিনীং, কালীং, সর্বকাম সমৃদ্ধিদাম্।"

আমরা শুধু কালীর বীজন্যাসের বা প্রাণায়ামাদিসহ ধ্যানগম্য-রূপের কাঠামোর কথাই এখানে বললাম; পূর্বে যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে তা এই ন্যাসেরই হুবহু প্রতিকৃতি। মহামারী থেকে রক্ষা পাবার জন্য সর্বজনীন রক্ষাকালী ও শ্মশানকালীর পূজা হয়। রটন্তী হয় মাঘে আর দেওয়ালী পূজা হয় দুর্গাপূজার পরবর্তী প্রথম কৃষ্ণা চতুর্দশীতে। দেওয়ালীর প্রচলন খুব বেশি দিন আগে ঘটেনি। কিংবদন্তী, নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে এ পূজা দেশে চালু হয়েছিল; সে তো মাত্র দুশ-আড়াইশ বছরের কথা। ফলাহারিণী পূজা হয় জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে।

শনি ও মঙ্গলবার দেবীপূজার পক্ষে প্রশস্ত। সাধারণত মধ্য-রাত্রে পূজায় বসতে হয়। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত কালীতন্ত্র মতে বাঙলার পূজার পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছে।

দেবীপূজায় পশুবলি প্রায় অপরিহার্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কুলবিধানকে মান্য করে, পশুর বদলে অন্য কিছু বলি দেওয়া হয়। পশুবলিতে প্রশস্ত মোষ ও ছাগ; শেষেরটিকেই এখন প্রায় একমাত্র বলির পশু বলা চলে।

তন্ত্রমতে দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা কালী। তারপরে রয়েছেন, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, কমলা বা ত্রিপুরসুন্দরী। এঁরা সবাই তন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাই এই সিদ্ধিদাত্রীদের সম্পর্কে কিছু কিছু বলা প্রয়োজন।

তারা ও কালীমূর্তির মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। তবে তারা-দেবী দিগম্বরী নন ; এঁর পরনে বাঘের চামড়া। আর যে সব প্রভেদ রয়েছে তা পরে দেখা যাবে।

তারা বা তারিণী দেবীকে নীলসরস্বতীও বলা হয়। কারণ ইনি বাক্‌শক্তি দেন। ইনি উগ্র বিপদ থেকে রক্ষা করেন বলে এঁকে উগ্রতারাও বলা হয়। ইনিও শ্মশানবাসিনী, শিবরূপী শবের ওপরে দণ্ডায়মান, ত্রিনয়নী। তিনটি চোখই প্রস্ফুটিত ইন্দীবর বা ফোটা নীলপদ্মের মত। এঁর বর্ণ শ্যাম, নরের মুণ্ডমালাই এঁর ভূষণ এমনকি কেশের শোভাবর্দ্ধনেও তা-ই তিনি ব্যবহার করেন। ইনিও চতুর্ভুজা ; এঁর দুটি ডান হাতে খড়্গ, বাঁ হাতের একটিতে খর্পর, অন্যটিতে একটি ফোটা পদ্ম। ইনি ভীমা হলেও, করালবদনা নন, এঁর মুখের দুধার দিয়ে রক্তও ঝরে না। কালীর উন্মত্ততা এঁর মধ্যে নেই।

ইনি রাজদ্বারে, সভাতে, বিবাদে ও বাণিজ্যে—সর্বকর্মেই জয়ী করেন।

এঁর পূজা হয় শ্মশানে, শূন্যালয়ে, চতুষ্পথে অর্থাৎ চৌরাস্তায়, শবাসনে, মুণ্ডাসনে, আকণ্ঠ সলিলে, রণভূমিতে, যোনিতে ও বিজন বনে। সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত হল একলিঙ্গ শিবমন্দির। একলিঙ্গ কাকে বলে ? যেখানে পঞ্চক্রোশের মধ্যে একটি ছাড়া দ্বিতীয় শিবলিঙ্গ নেই তাঁর-ই নাম একলিঙ্গ।

মহাবিদ্যা ষোড়শীর ধ্যানরূপ উদ্ধৃত করছি ;

"বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশ শরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাংশ্রয়ে॥"

এঁর প্রভা নবোদিত সূর্যের মত। এঁর চারটি হাত; হাতে রয়েছে পাশ অর্থাৎ বন্ধনাস্ত্র, অঙ্কুশ অর্থাৎ ডাঙ্গশ, তীর ও ধনু। ইনিও ত্রিনয়নী; শিবের নাভিকমলের ওপর বসে রয়েছেন। ইনি আলুলায়িত কুন্তলা অর্থাৎ মুক্তকেশী, তরুণী, রূপসী। এঁর গলায় সুশোভন হার ও মাথায় স্বর্ণমুকুট।

রত্ন-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা, বহু রত্নভূষণে ভূষিতা ভুবনেশ্বরী রূপে ও ঐশ্বর্যে সত্যি ভুবনেশ্বরী। ইনি রক্তবর্ণা, মুকুটধারিণী ত্রিভুবনের অধীশ্বরীরূপে রক্তকমলের ওপর ডান পা রেখে, বাঁ পা রেখেছেন নিজের ডান উরুতে। এঁরও চারটি হাত, চোখ তিনটি। ডান হাতে বর ও অভয় মুদ্রা, বাঁ হাত দুটিতে পাশ ও অঙ্কুশ। ভুবনেশ্বরী সর্ব ঐশ্বর্য ও পরম শক্তিদায়িনী।

ভৈরবী মূর্তির পরম সাদৃশ্য রয়েছে ভুবনেশ্বরীর সাথে। ইনি 'উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং' 'রক্তালিপ্তপয়োধরাম্'।

ইনি বসেছেন পদ্মের ওপর, পদ্মে ডান পা-টি রেখে, ঠিক ভুবনেশ্বরীর ভঙ্গীতে। ইনিও ত্রিনয়না; চোখগুলি অতুলনীয় সুন্দর। প্রভায় ইনি ষোড়শীকে হার মানান। পরনে এঁর ক্ষৌমবাস অর্থাৎ রেশমি বস্ত্র বা তিসির ছাল থেকে তৈরী কাপড়। পয়োধরে রক্তের দাগ; রত্নালঙ্কারে ইনি ভুবনেশ্বরীর সমকক্ষ। এঁরও হাত চারটি; হাতে কোনো অস্ত্রসস্ত্র নেই—রয়েছে জপের মালা ও কাপড়। ইনিও মুক্তকেশী, রত্নমুকুটধারিণী, ও পদ্মবনবাসিনী। ভুবনেশ্বরীর গলায় মুণ্ডমালা নেই, এঁর রয়েছে।

ছিন্নমস্তা নামটি এসেছে ছিন্ন মস্তক বা মাথা থেকে। রূপকল্পনায় এ দেবীটি অত্যাদ্ভুত; ইনি নিজের হাতে নিজের মাথা কেটে রক্তপান করছেন! এদিক থেকে তিনি অনন্যা। ইনি জাতে বৌদ্ধ, কিন্তু পরিচয়ে হিন্দু।

ইনি প্রত্যালীঢ়পদা অর্থাৎ এঁর বাঁ পা প্রসারিত আর ডান পা সংকুচিত। এঁর দুটি হাত; একটিতে ধরেছেন নিজের কাটামুণ্ড

অন্যটিতে খড়্গ। ইনি বিবসনা। নিজের গলদেশ থেকে যে রক্তধারা ঝরছে তা পান করছেন তিনি নিজেই, তাঁর ছিন্ন মস্তকের মুখ দিয়ে। সে রক্তপান করছেন তাঁর দুজন সঙ্গিনী। এঁদের একজনের নাম বর্ণিনী, অন্যজনের ডাকিনী। বর্ণিনী রয়েছেন দেবীর ডানদিকে ; এঁর কেশ আলুলায়িত, এক হাতে খর্পর, অন্য হাতে খড়্গ। ইনি বিবসনা। দেবীর বাঁ দিকে রয়েছেন ডাকিনী। ইনি কৃষ্ণবর্ণা, মুক্তকেশী ও বিবসনা। এঁরও হাতে খর্পর ও খড়্গ। প্রলয়ের কালে ইনি বিশ্বজগৎ অনায়াসে গ্রাস করতে পারেন—এমনি এঁর শক্তি।

দেবীর গায়ের রং জবাফুলের মত লাল। এঁর মাথায় (অর্থাৎ ছিন্নশিরে) সর্পাবদ্ধ মণি, তিনটি চোখ, গলায় পদ্মের মালা। তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন মদন (কামদেব) ও রতি এই দম্পতির ওপর। তাঁরা শায়িত রয়েছেন একটি ফোটা পদ্মের মধ্যে। বর্ণিনী ও ডাকিনী দাঁড়িয়েছেন সেই পদ্মটিরই দুটি পাপড়ির ওপরে।

মুক্তকেশী দেবী বগলামুখী শত্রু পরিপীড়নে ব্যস্ত। ইনি দ্বিভুজা ; বাঁ হাতে ধরেছেন শত্রুর জিহ্বা টেনে আর ডান হাতে তাকে গদা দিয়ে আঘাত করছেন। ইনি রত্নসিংহাসনের ওপর বসে রয়েছেন "পীতাম্বরাভরণমালা বিভূষিতাঙ্গীং," অর্থাৎ তাঁর পরনে হলদে শাড়ি, মালায় বিভূষিত দেহ। ইনি 'চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিত চারুগণ্ডস্থলীং' —এঁর সুন্দর কপোল বা গাল সোনার দোদুল কর্ণাভরণে আরো শোভাময় হয়েছে। ইনি গৌরাঙ্গী, বিম্বাধরা অর্থাৎ এঁর ঠোঁট পাকা তেলাকুচার মত লাল।

বগলামুখীর শরণ নিতে হয় কখন? চৌরসঙ্ঘে, প্রহরণ সময়ে, বন্ধনে, ব্যাধিতে, স্তম্ভনে, বিবাদে, রিপুবধসময়ে। এঁর পূজার মন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রের মত অব্যর্থ—স্তম্ভনে অমোঘ, এমন কি এ মন্ত্রে পবনেরও গতিরোধ করা চলে।

মহাবিদ্যা ধূমাবতীর চিত্রে পাওয়া যায় মহা ঐশ্বর্যময়ী দেবীদের ঠিক বিপরীত ছবি। এঁর ধ্যানরূপ উদ্ধৃতি করছি :

"বিবর্ণা, চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্তকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা।
সূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা॥
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া॥"

সংক্ষেপে, ইনি মলিন, চঞ্চল, ক্রুদ্ধ, উগ্র, নিষ্ঠুর, স্বামিহীনা, বিগত-যৌবনা, খল-স্বভাবা, সদা ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর ও সর্বদা কলহে এঁর অভিরুচি। ময়লা একখানা কাপড় পড়ে চড়েছেন রথে —সে রথের চূড়ায় বসে রয়েছে একটি কাক। এঁর হাতে রয়েছে একখানি সূর্প অর্থাৎ কুলা!

এ হেন 'গুণশালিনী' দেবীকে কি পরমাশক্তির প্রতীক বলে মানা যায়? হয়ত দ্বিধা আসে। কিন্তু ইনি যে-মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সে মন্ত্রের ব্যবহার তো হয় শত্রুদলনে, উচ্চাটনে ও বিদ্বেষণে। হয়ত এঁর রূপকল্পনা ষট্‌কর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে। কি কারণে মহাবিদ্যার দলে ঠাঁই পেয়েছেন তা বলা দুষ্কর। এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি তামসী শক্তির প্রতীক।

ধ্যানরূপে মাতঙ্গী বা মাতঙ্গিনী দেবী হলেন:

"শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং
ত্রিনয়নাং রত্ন সিংহাসন স্থিতাং।
বেদৈর্ব্বাহুদণ্ডৈরসি খেটক-
-পাশাঙ্কুশধরাম্॥"

দেবী মধ্যযৌবনা ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, ত্রিনয়নী, রত্ন-সিংহাসনে বসে রয়েছেন। এঁর চারটি হাত; হাতে অসি বা খড়্গ, খেটক বা দণ্ড, পাশ ও অঙ্কুশ।

এঁর সাধনায় সাধকের অগ্নিস্তম্ভন, জলস্তম্ভন ও বাক্যস্তম্ভনের

শক্তি জন্মে। বিবাদে, শাস্ত্রে ও কবিত্বে পরম অধিকার জন্মে। এঁর পূজায় ভোগ্যদ্রব্যের মধ্যে মৎস্য, মাংস ও পায়েস সর্বশ্রেষ্ঠ।

মহাবিদ্যা কমলা পদ্মবনের রানী। এঁকে স্নান করাচ্ছে চারটি হাতি—তারা এনেছে সোনার ঘড়াতে করে অমৃত। এঁর হাত চারটি—তাতে রয়েছে বর ও অভয় আর দুটি পদ্ম; কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই। এঁর পরনে ক্ষৌম বসন, গায়ে অপূর্ব ও অসংখ্য রত্নালঙ্কার; পদ্মাসনে, পদ্মের ওপর বসে রয়েছেন। সোনার মত এঁর দেহকান্তি।

এঁর সাধনায় সাধকের সম্পদ্ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়। 'শ্রী' এই একাক্ষর বীজই লক্ষ্মীদেবীর মন্ত্র।

বৌদ্ধতন্ত্রের কালী, সরস্বতী ও ভদ্রাকালী, এ তিনটি দেবীই মহাদেবী তারার প্রতিচ্ছায়া। বাঙলায় অধুনা যে সরস্বতী পূজা হয়, তা ঠিক পৌরাণিক সরস্বতীর পূজা নয়; মনে হয় তান্ত্রিক। এ মন্তব্যের একটি প্রধান কারণ রয়েছে সরস্বতী পূজার মন্ত্রের মধ্যেই নিহিত। সে মন্ত্রটির উল্লেখ করা যাচ্ছে:

"ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমোঽনমঃ"

অর্থাৎ এখানে সরস্বতী ও ভদ্রকালীকে এক করে দেখা হচ্ছে।

তন্ত্রমতে সরস্বতী "শুক্লাম্বরধরাং দেবীং শুক্লাভরণভূষিতাং"—তাঁর আভরণ ও ভূষণ সবই ধবল, শুভ্র। দেবী পুস্তকহস্তা, হাস্যময়ী, 'কুমতিধ্বান্তবিধ্বংসমীড্যো', কবিদের সিদ্ধিদাতা। এঁর অন্য নাম ভারতী।

তন্ত্রমতে 'সারস্বতকল্পে'র নামান্তর বাগীশ্বরীপূজা। বাগীশ্বরীর প্রভা সূর্যমণ্ডলের জ্যোতিঃপুঞ্জের মত। এঁর হাতে বর ও অভয় মুদ্রা। ইনি পুস্তকধারিণী। এঁর পূজায় জাড্য দূর হয়, মেধা বৃদ্ধি পায়; সাধক বাক্‌সিদ্ধ ও কবিশ্রেষ্ঠ হন।

শিব তন্ত্রের পরম দেবতা। তাঁর কথা বহু অধ্যায়েই কিছু কিছু বলা হয়েছে। তার সঙ্গে এসেছে বিষ্ণুর কথাও। মোটের ওপর পঞ্চো-

পাসক হিন্দুকে, অর্থাৎ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য উপাসক সবাইকে, ঘিরে রেখেছে তন্ত্র।

এখন বাঙলার প্রধান বার্ষিক পূজা অর্থাৎ শারদীয়া দুর্গা পূজার কথা বলে এ অধ্যায়ের ছেদ টানছি।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গারও জন্ম হয়েছে বন্যদের ঘরে; সে বন্যদের নাম শবর, বর্বর, পুলিন্দ ইত্যাদি। মহাভারতের বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠির দেবী দুর্গার স্তব করেছেন। এ স্তবটি যে হরিবংশে উদ্ধৃত আর্য্যা-স্তবেরই রূপান্তর মাত্র তা প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা চলে। এ দুটি স্তবেই দেবী

"শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।"

"কুক্কুটৈশ্ছাগলৈর্মেষৈঃ সিংহৈ র্ব্যাঘ্রৈঃ সমাকুলা"

"সুরামাংস বলিপ্রিয়া।"

দেবী বিন্ধ্যপর্বতে থাকেন; শবর, বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি বন্য (বা অনার্য) জাতিরা তাঁকে পূজা করে। তাঁর বাসস্থানের আশপাশে থাকে কুক্কুটের অর্থাৎ মোরগ-মুরগীর দল, ছাগল, মেষ, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি। দেবীর মাথায় ময়ূরের পাখা। দেবী অপর্ণা অর্থাৎ (ব্যাখ্যা-বিশেষে) বিবসনা—গাছের পাতা বা ছালও তাঁর পরণে নেই। ইনি তিনটি নামে শবর জাতির ইষ্টদেবতা—সে তিনটি নাম হল, শবরী, পর্ণশবরী ও নগ্নশবরী। মদ, মাংস ও বলি এ তিনটি দেবীর প্রিয় বস্তু।

দেবী তাঁর সেবকদের যুদ্ধক্ষেত্রে, অগ্নিদাহে, নদীতীরে, কান্তারে, প্রবাসে, রাজরোষে, চোরের ভয় ও শত্রু ভয় থেকে রক্ষা করেন।

বৌদ্ধেরা এঁকে শুদ্ধ করে পর্ণশবরী থেকে একেবারে দেবী তারায় রূপান্তরিত করেছেন; হিন্দু পৌরাণিকেরা এঁকে চণ্ডীরূপে পূজার বেদীতে বসিয়েছেন।

ক্রমে দেবী তারা স্থান পেয়েছেন মহাবিদ্যার দলে আর দেবী চণ্ডী রূপান্তরিত হয়েছেন দেবী দুর্গায়। দুয়েরই পূজা হয় পুরোপুরি

তান্ত্রিক মতে ; এমন কি, তন্ত্রদীক্ষা যাঁর হয়নি তিনি তারা বা দুর্গা পূজার কোনো কাজই করতে পারেন না, পূজা তো নয়-ই।

বাঙলায় শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা হয় মহা জাঁকজমকে, বিশেষকরে বারোয়ারী। সেটা বাৎসরিক। তাই বলে নিত্যপূজা যে কোথাও হয় না, তা নয়। তা-ও হয় ; গৃহস্থের ঠাকুরঘরে বা সর্বজনীন মন্দিরে। নানারূপে তাঁর পূজা হয়—দুর্গা, নবদুর্গা, শূলিনী, বনদুর্গা, জয়দুর্গা ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে।

আদিমরূপে দেবী দুর্গা চতুর্ভুজা। তিনি সিংহের পিঠে বসে রয়েছেন। তাঁর চারটি হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ। সর্বাঙ্গে তাঁর নানা অলঙ্কারের ছড়াছড়ি।

শূলিনীর রং কালো, তাঁর হাত আটটি ; হাতে রয়েছে শূল, বাণ, খড়্গ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনু ও পাশ। ইনি ত্রিনয়না, কপালে অর্ধচন্দ্র। শত্রুদলনে তিনি ভয়ঙ্করী। সঙ্গিনী তাঁর চারজন—সবারই হাতে গদা বা কারো কারো মতে খড়্গ ও খেটক।

রূপে বনদুর্গা ভয়ঙ্করী। ইনি মোটামুটি লৌকিক দেবতা অর্থাৎ গ্রাম্যদেবতা। এঁর খ্যাতি আঞ্চলিক—বিবাহ প্রভৃতি শুভকার্যের পূর্বে মঙ্গলকামনায় এঁর পূজা দেওয়া হয়—কোথাও মানতও থাকে।

জয়দুর্গার পূজা বেশি প্রচলিত নয়। এঁর পূজা-প্রণালী শবর-গন্ধী। পূজার সঙ্গে যোগ রয়েছে নগ্ননৃত্যের, এমনকি দেবীর প্রতিও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগের! দেবীর রং মেঘের মত ঘোর কৃষ্ণ ; কপালে অর্ধচন্দ্র, চারিটি হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল। ইনি ত্রিনয়না এবং সিংহারূঢ়া। এঁকে মাছ পুড়িয়ে ভোগ দেওয়া হয়।

দেবী জগদ্ধাত্রীও দেবী দুর্গারই অন্যতর রূপ। এঁর পূজা হয় কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে। ইনিও সিংহের পিঠে বসে রয়েছেন, হাতও এঁর চারিটি। কিন্তু এঁর গলায় ঝোলানো রয়েছে একটি সাপের পইতা অর্থাৎ উপবীত।

বাঙলার এই শারদীয়া দুর্গাপূজার জন্মকথার কোনো প্রামাণিক

ইতিহাস নেই। প্রবল কিংবদন্তী এই, শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের পূর্বে দেবী দুর্গার অকালবোধন করে তাঁর পূজা করেছিলেন আর তাঁর বরলাভ করেই শ্রীরামের পক্ষে রাবণ বধ সম্ভবপর হয়েছিল। অথচ, রামায়ণ রচয়িতা আদিকবি বাল্মীকির পুঁথিতে এ ব্যাপারের কোনো উল্লেখই নেই! মূল সংস্কৃত রামায়ণে দেখা যায়, শ্রীরাম রাবণবধের জন্য করছেন সূর্যের পূজা আদিত্যহৃদয় স্তব পাঠ করে। এ স্তব পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন অগস্ত্যমুনি।

তবে এ সমস্যার সমাধান কি?

আমাদের মনে হয়, এর কারণ দুটি; একটি পরোক্ষ, অন্যটি প্রত্যক্ষ।

একদা ভারতবর্ষের সর্বাঞ্চলেই যে শরৎকালে শক্তিপূজার একটা হিড়িক পড়ে যেত তাতে সন্দেহ নেই। পূর্বাঞ্চল তার জের এখনো টানছে শারদীয়া দুর্গাপূজায়, কোথাও কোথাও রয়েছে 'নবরাত্রি'র উৎসব, উত্তরাপথে সেই চিরাগত শক্তিপূজার প্রতীকই 'রামলীলা' আর দক্ষিণাপথে দশহরা বা নবরাত্রি। এ কারণটি পরোক্ষ; হয়ত বহুপূর্বে পূর্বাঞ্চলে এর রূপ ছিল ভিন্নতর। এ সম্পর্কে এ কথাও স্মরণীয় যে এ সময়ে রাজারা দেবার্চনা করে দিগ্বিজয়ে অর্থাৎ শক্তি-সাধনায় বের হতেন।

কিন্তু শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রত্যক্ষ নিদর্শন রয়েছে পঞ্চদশ শতকের কীর্তিমান্ বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের বাঙলা রামায়ণে। সে পুঁথিতে কবি এই অকাল-বোধনের এমন সুস্পষ্ট ও সজীব চিত্র এঁকেছেন যে তা প্রত্যেক বাঙালীর মনেই চিরতরে গেঁথে রয়েছে—কখনো তা আর ধুয়ে মুছে যেতে পারে না। কৃত্তিবাসই বা এ অপরূপ কাহিনী কোথা থেকে পেলেন এ সমস্যা নিয়ে কথা উঠেছে। হতেও পারে যে এ চিত্রটি তাঁর কল্পনাপ্রসূত কিন্তু আমাদের মনে হয়, তিনি এটি আহরণ করেছেন 'কালিকা পুরাণ' থেকে। এ পুরাণটি চতুর্দশ শতকের বাঙালীরই লেখা পুঁথি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে (দেবী মাহাত্ম্যে) দেবীর জন্মকাহিনী ভিন্নতর। সেখানে রাম-রাবণের কথা নেই, আছে ক্ষত্রিয় রাজা সুরথ ও বৈশ্যপ্রধান সমাধির কথা। দেবীর প্রসাদে এ দুজনেরই মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল। সুরথ চেয়েছিলেন প্রেয়বস্তু অর্থাৎ জগতের যত সুখ সম্পদ্ আর সমাধি চেয়েছিলেন শ্রেয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। দুর্গা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদাত্রী ; তাঁর পূজায় যার যা কাম্য তা-ই পাওয়া যাবে।

কৃত্তিবাসের কাল থেকেই যে বাঙলায় দুর্গাপূজার বহুল প্রচলন ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই তবে তার আগেও দুর্গা অর্থাৎ চণ্ডী পূজার উল্লেখ রয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শতকের স্মার্তপণ্ডিত জীমূতবাহন থেকে ষোড়শ শতকের রঘুনন্দন পর্যন্ত একটানা অনেকেই এ পূজার উল্লেখ করেছেন। অনেকের মতে বাঙলার এই ঘরে ঘরে দুর্গাপূজার প্রবর্তন হয়েছে অষ্টাদশ শতকের নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে। কথাটা হয়ত আংশিক সত্য। দেবীর পূজা মোটামুটি পৌরাণিক—নন্দিকেশ্বর, দেবী, কালিকা ও মৎস্য প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু আচার ও অনুষ্ঠানে পুরোপুরি তান্ত্রিক।

পুরাবৃত্তে, অর্থাৎ প্রাচীনকালের বৃত্তান্তে রয়েছে শুধু দেবী চণ্ডী বা দুর্গার একক রূপ। তাঁর অধুনাতন পারিবারিক রূপের কোনো পুরনো মূর্তি এখনো পাওয়া যায় নি। আর পাওয়া যাবার কথাও নয়, কারণ আমাদের মনে হয়, এটি বহু পরবর্তী কালের সৃষ্টি—বাঙালীর নিজস্ব কীর্তি। ঠিক কোন সময়ে যে গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী দেবী দুর্গার সাথে এসে যোগ দিয়েছিলেন তা বলা দুষ্কর, তবে এ চিত্রটির অন্তস্থলে রয়েছে বাঙালীর পরিবার-প্রীতির কল্পনা ও চিহ্ন। মা দুর্গা এলেন পিত্রালয়ে—সারা বছরে মাত্র তিনটি দিন থাকবেন। এমন কোন্ বাঙালী মহিলা আছেন যিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের তাদের মামাবাড়িতে না নিয়ে আসবেন ?

এখন প্রতি বছর দেবী বাঙলায় আসেন মহিষমর্দিনীর রূপে। এই রূপ তাঁর মহিষাসুর বধের কাহিনীর সঙ্গে গাঁথা। মহাভারতেও দেবীকে 'মহিষাসৃক্‌প্রিয়া', অর্থাৎ মহিষের রক্ত তাঁর প্রিয়, বলা হয়েছে। হয়ত এই বিশেষণটি থেকেই পুরাণের মহিষাসুরের উৎপত্তি ঘটেছে ; চণ্ড, মুণ্ড, শুম্ভ, নিশুম্ভ ক্রমে পেছনে পড়ে গেছে। এই মহিষাসুরমর্দিনীর রূপেই তিনি আসেন বাঙালী পিতার আলয়ে সপরিবারে।

দেবীর রূপ এখন মহিষাসুরমর্দিনী ভিত্তিক হলেও, রং ভঙ্গী বেশভূষা প্রভৃতিতে প্রতি বছরই অনেক পরিবর্তন ঘটছে। বারোয়ারী পূজা যত বাড়ছে, তত বেড়ে যাচ্ছে এই পরিবর্তন। অনেক মূর্তিতে দেখানো হচ্ছে যে দেবী সপরিবারে যুদ্ধ করছেন।

বাঙালী গৃহস্থের পারিবারিক পূজায় দেবীর রূপ পরিবর্তন বিশেষ ঘটেনি কিন্তু বারোয়ারী পূজায় হয়েছে তাঁর নব নব রূপ। এর একমাত্র না হোক, প্রধান কারণ হল এই যে বারোয়ারী পূজা এখন পুরোপুরি একটা সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। জাতির পক্ষে এ পরিবর্তন অশুভ বলে মনে করার কারণ নেই।

দেবীর বোধন হয় ষষ্ঠী তিথিতে—বিসর্জন হয় দশমীতে। মাঝের তিনটি দিন হয় তাঁর পূজা ; এর মধ্যে অষ্টমী পূজাই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পূজার মধ্যে এক মহাপর্ব—মহাস্নান। এ স্নানের উপচারের বৈচিত্র্য বহু। এতে প্রয়োজন নানা বস্তুর ; ঠাণ্ডা জল, গরম জল, শঙ্খের জল, গঙ্গাজল, সাগরের জল, সরস্বতী নদীর জল, বৃষ্টির জল, ঝর্নার জল, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, পঞ্চকষায়, চিনিপানা, চন্দন-জল, হাতির শুঁড়ে খোঁড়া মাটি, শূকরের পায়ে খোঁড়া মাটি, ষাঁড়ের শিংএ খোঁড়া মাটি, বেশ্যালয়ের মাটি, উঁইপোকার ঢিপির মাটি, চড়ার মাটি, গঙ্গামাটি, নদীতীরের মাটি, সমুদ্রের মাটি, গোয়ালের মাটি, চৌরাস্তার মাটি—নেই কি? লোকে কথায় বলে, এ যেন দুর্গোৎসবের ঘটা!

দেবীর প্রতিমা বিসর্জন পর্বে এখনও শবর-জাতীয় আদিম, অসুন্দর প্রথা কিছু কিছু রয়েছে। এখনও কোথাও কোথাও কাদা মাটি ছড়ানো হয়, নানা অশ্লীল কার্যকলাপও দেখা যায়!

কিন্তু সে সব অশোভন চাঞ্চল্যের শুভ নিবৃত্তি হয় শান্তিজলে। প্রতিমাবিসর্জনের পরে শূন্য দেবীমণ্ডপের মধ্যে বসে, পুরোহিত সকলের মঙ্গলকামনা করে করেন শান্তিমন্ত্র পাঠ তারপর শান্তিজল ছিটিয়ে দেন সকলের মাথার ওপর। উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সবাই একে অন্যের সঙ্গে করে কোলাকোলি, অবশেষে যার যার প্রণম্যদের প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। এটা চিরাচরিত সামাজিক রীতি।

কারো কারো মতে দুর্গা পূজার জন্ম হয়েছে কৃষকের গৃহে—এটি কৃষিজাত ফসলেরই পূজা ; প্রমাণ, নবপত্রিকা বা 'কলাবৌ'য়ের পূজা।

এই নবপত্রিকা কি কি? কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান। এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, কালী, দুর্গা, কার্তিকী, শিব, রক্তদন্তিকা, শকরহিতা, চামুণ্ডা ও লক্ষ্মী।

এ নয়টির একত্র সমাবেশে আবার সেই দুর্গারূপ!

এবার দেবী দুর্গার আর একটি রূপের কথা বলে দুর্গামণ্ডপ বা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বিদায় নেব। সেটি গন্ধেশ্বরীর রূপ।

গন্ধেশ্বরীর পূজা করে স্বর্ণবণিকেরা অর্থাৎ যারা বাঙলার প্রকৃত বৈশ্যসম্প্রদায়—বাণিজ্যে, বিশেষ করে বহির্বাণিজ্যে, যারা এদেশকে একদা সমৃদ্ধ করেছিল। পূজা হয় পহেলা বৈশাখ নূতন বছরের প্রথম দিনে। ইনি ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে মহিষাসুরমর্দিনী। এঁর মাথায় জটা, শিরোভূষণ অর্ধচন্দ্র, বর্ণ অতসী ফুলের মত হলুদ—হাত দশটি। ডান হাতে ওপর থেকে পরপর রয়েছে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণ বাণ ও শক্তি ; বাঁ হাতে রয়েছে ওপর থেকে খেটক, ধনু, পাশ, অঙ্কুশ ও ঘণ্টা বা কুড়াল।

অবশ্য তন্ত্রোক্ত রূপের সাথে এর মিল নেই।

সপ্তম অধ্যায়

বাঙালীর তান্ত্রিকতা ও তন্ত্র ব্যাখ্যান

যদি কোনো অসীম ধৈর্যশালী পাঠক, একটা অসাধ্য সাধনের পণ করে পর পর ছয়টি অধ্যায়ই পাঠ করে থাকেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার, বিশেষ করে ঠাকুর ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপের আচার, নিয়ম ও নিষ্ঠার কথা মনে করে থাকেন তবে আর তাঁকে বলতে হবে না বাঙালীর সঙ্গে তান্ত্রিকতার সম্পর্ক কি। কিন্তু এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে তেমন পাঠক বিরল। কারণ তন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষিত জনের মনে জেগেছে নিদারুণ অবজ্ঞা; আর সে সর্বজনীন তাচ্ছল্যের পরম হেতুও রয়েছে বিকৃত রুচির পরিচায়ক ও নৈতিক অবনতির পিচ্ছল সোপান পঞ্চ 'ম-'কার সাধনায়।

তাই এ কথাটা বারবার স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা প্রয়োজন যে জাতি হিসাবে বাঙালী ঘোর তান্ত্রিক। মাছ যেমন জলে বাস করে জলের সত্তাই পুরোপুরি বিস্মৃত হয়, বাঙালীও তেমনি তন্ত্রজগতে বাস করে শুধু তন্ত্রের অস্তিত্বকেই ভোলে নি. এ সম্পর্কে যে জ্ঞাতব্য কিছু রয়েছে বা থাকতে পারে তা-ও কখনো মনে করে না।

সকল প্রকার কর্তব্য কর্মের অর্থে বাঙালী হিন্দু বলে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। তাতে, চণ্ডীপাঠের (বেদ পাঠ নয়) মধ্যে, তন্ত্রকেই যে সে অজানত সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিচ্ছে সে কথা তার মনে পড়ে না। তার অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংস্কারে রয়েছে তন্ত্রের প্রবল প্রভাব। বেদের দেবতাদের মধ্যে কেউ কি এখন আর তার উপাস্য রয়েছে? যাঁরা রয়েছেন, যেমন বিষ্ণু ও শিব, তাঁরাও তন্ত্র পথেরই নির্ধারক। কৃষ্ণ ষট্‌কর্মের অন্যতম কর্ম 'শান্তি স্বস্ত্যয়ন' এখনও সকল গৃহস্থই মান্য করে চলে; অন্য পাঁচটি

অবশ্য আধুনিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে নিন্দিত ও অপ্রিয় হয়ে সমাজের এক অন্ধকার কোণে পড়ে রয়েছে।

বাঙালীর আরাধ্য দেবতা, কালী, দুর্গা, চণ্ডী, সরস্বতী, শিব প্রভৃতি, সবাই তান্ত্রিক দেব দেবী। পুরাণ মূর্তি গড়েছে বটে, তবে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে তন্ত্র। বাঙালী সমাজে পৌরোহিত্যের শক্তি এনেছে তন্ত্র, গুরুবাদের সৃষ্টি করে ক্রমে তার গুরুত্ব দিয়েছে তন্ত্র। বেদবিহিত উপনয়নে শিক্ষাগুরু আচার্যের পাশাপাশি বসেছেন ক্রমে ক্রমে তান্ত্রিক গুরু। 'আচার্য-গুরু' এই যুগ্ম নামে দুজনই এখনো বজায় আছেন বটে, তবে কার্যত গুরুকে তাঁর আসন ছেড়ে দিতে হয়েছে আচার্যের। এখন আচার্য প্রায় নেই, কিন্তু গুরু রয়েছেন। বাঙলায় ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত তন্ত্রের প্লাবন ছিল অক্ষুণ্ণ। পরম রহস্যাবৃত তান্ত্রিক কার্যকলাপে ছিল বাঙালীর প্রবল অনুরক্তি ; গুপ্তধন লাভের মত অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য ছিল তার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। এই বিংশ শতকেও বাঙালী সাধারণের 'ঠাকুর' বা মনুষ্যরূপী দেবতা হলেন পরম সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। 'পরমহংসদেব' হল তাঁর সংজ্ঞা। সাধারণ জন ভুলে গেছে যে এ সংজ্ঞাটাই তাঁর শক্তি সাধনার অর্থাৎ তন্ত্রসাধনার কথা ব্যক্ত করে দিচ্ছে। তন্ত্রমতে কৌলধর্মীরা পঞ্চ 'ম'-কার সাধনায় সিদ্ধি হয়ে পরমহংসত্ব লাভ করেন অর্থাৎ পাশমুক্ত বা জ্ঞানমুক্ত হন। বেদ ও তন্ত্র দুয়ের মতেই জীবদ্দশায়ই জ্ঞানমুক্তি সম্ভবপর।

কিন্তু এ সব তো গেল বাইরের আচার, নিয়ম ও নিষ্ঠার কথা। বাঙালীর অন্তর্জগতেও পড়েছে তন্ত্রবাদের অক্ষয় ছাপ। সে ছাপের প্রভাবে যে বাঙালী জাতির মনোজগতে নানা পরিবর্তন ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে প্রবল তান্ত্রিকবাদের প্রভাবেই তার মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে যে তার ফলেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে তার প্রভেদ স্পষ্ট হয়েছে।

অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় বাঙালীর মধ্যে প্রাদেশিক ভেদজ্ঞান অনেকাংশে কম। কেন? কারো কারো মতে বাঙলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহর সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে গড়ে উঠেছে সারা বিশ্বের নানা স্থানের মানুষের সহযোগিতায়। বাঙালীর সঙ্গে বহু শতকের এই দেশী-বিদেশীর অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক তাকে একটা সংকীর্ণ প্রাদেশিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হতে দেয়নি। কথাটা হয়ত আংশিক সত্য; তবু মনে হয় বোম্বাই, মাদ্রাজ, কালিকটও তো প্রায় অনুরূপ ভাবেই গড়ে উঠেছিল। তবু এ প্রভেদ কেন?

আমাদের মনে হয়, এর প্রধান কারণ বাঙালীর অন্তর্জীবনের বিভিন্নতা। সেটা জন্মগত সংস্কারের পর্যায়ে, আর তার রচক তন্ত্রবাদ।

কথাটা একটু স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

বেদবিহিত শ্রেয়ঃপন্থার মুলতত্ত্ব হল ত্যাগ, ধাপে ধাপে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে বন্ধনচ্যুতি। ত্যাগের নামান্তর বর্জন। সাধারণজনের কাছে ত্যাগ বা বর্জন কি তার সত্য বা যথার্থ রূপে দেখা দেয়? তা দেয় না, দিতে পারেনা। যে রূপে ত্যাগ সাধারণজনের বোধগম্য হয়, তার নাম নিছক বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা। বর্জনের জন্মগত সংস্কার তার ভেদজ্ঞানকে ক্রমশ প্রখর করে তোলে।

এদিকে তন্ত্রবাদের প্রেয়োবাদের মুলতত্ত্ব অর্জন। এ অর্জন সর্বগ্রাসী—এতে কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। স্নেহ, মমতা, দ্বেষ, নির্দয়তা, সুখ, দুঃখ, যশ, অপযশ, বন্ধু, শত্রু কাউকেই পরিহার করা চলে না। এ সকলের সংমিশ্রণেই রচিত হয়েছে এ জগদ্ব্রহ্মাণ্ড—এর প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে সংযোগসাধনের নামই যোগ যা পরমতত্ত্ব লাভের একমাত্র পথ।

বহুযুগের এই তান্ত্রিকবাদের প্রভাব সাধারণজনের মনে যে সংস্কারের সঞ্চার করেছে তার ফলে পরকে তার ততটা পর, ততটা

অপ্রয়োজনীয়, ততটা পরিহার্য বলে মনে হয় না। যতটা হয় ত্যাগ-ধর্মীর সংস্কারগত মনে।

ত্যাগধর্মীর বর্জন নঞর্থক, প্রেয়োধর্মীর অর্জন সদর্থক। বহুযুগের এই বর্জন ও অর্জনের সংস্কারজাত মনের প্রভেদেই অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে বাঙালীর মনের এই বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা সাধারণ মানুষের স্তরের কথা। শ্রেয় ও প্রেয় পন্থার প্রকৃত সাধকের সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়।

তন্ত্রের মতে জগতে পরিহার্য বস্তু কিছু নেই। শক্তিপূজায় বিশ্বের সমস্ত জিনিসেরই প্রয়োজন। নইলে সে পূজা সার্থক হয় না। বহুযুগের এই পরিহার্য ও অপরিহার্যমূলক দ্বন্দ্বের মধ্যে সংস্কারগত ভাবে যে প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে তার ফলেই বাঙালীর মধ্যে গোঁড়ামি বা অন্ধভক্তি অপেক্ষাকৃত কম।

দ্বিতীয়ত, বাঙালীর মন, অন্যপ্রদেশবাসীর মনের তুলনায়, সহজেই উচ্ছলিত হয়ে ওঠে আর সে উচ্ছলতা অনায়াসেই পরিণত হয় প্রবল উন্মাদনায়। কাহারো বিন্দুমাত্র রূঢ়তায়ও তার মন বিষিয়ে যায়—তা সে সহ্য করতে পারে না। ব্যবহারিক জগতে এজন্য হয়ত অনেকক্ষেত্রে তাকে প্রচুর দণ্ড দিতে হয়, তবু এই সহজাত সংস্কারকে সে বর্জন করতে পারে না।

এটাও বহুযুগের তন্ত্রজাত সংস্কারের ফল।

দেবী চণ্ডীর কাছে তার প্রার্থনা 'দ্বিষো জহি' অর্থাৎ শত্রুকে বধ কর। অহিংসা দিয়ে হিংসা জয়ের কোনো প্রশ্ন নেই; বাঙালীর মজ্জাগত বিশ্বাস তা নয়। তার ফলেই বারবার ঘটেছে বাঙলার বিপ্লবপন্থীদের অভ্যুত্থান। এটাও তার সহজাত সংস্কার।

'দ্বিষো জহি'র বা শক্তিপূজার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে রজোগুণের প্রাবল্য; তামসিকতার বন্ধনকে বাঙালী এড়াতে চেয়েছে এই রজোগুণের সহায়তায়—যাতে ক্রমে সে সত্ত্বের স্তরে গিয়ে পৌঁছাতে পারে অল্প আয়াসে। এটাই স্বাভাবিক ক্রম। অন্যত্র

'তম' থেকে 'সত্ব' লাভের মধ্যে যে ফাঁকি রয়েছে তারই খেলা। ঘোর তামসিক মনে 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' কি কোনো সাড়া জাগায় না জাগাতে পারে? তাতে শুধু ক্লৈব্য, জড়তা ও ভীরুতাই বাড়ে মাত্র। এ যেন ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার মত।

বাঙালীর এই চিত্তচাঞ্চল্য বা স্বাভাবিক রজোগুণ বহুযুগের তন্ত্রবাদ-জাত সংস্কার; বাঙালীর মর্মভেদী বাণ খুব ধারাল না হলেও চলে।

তান্ত্রিক সংস্কারেরই আর একটি ফল মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা। সর্বপ্রকৃতির মধ্যেই বাঙালী মাতৃসাধনা করে। তার কাছে তার নিজের জননীই বিশ্বের আদ্যাশক্তির প্রতীক। এটা বাঙালীর স্বাভাবিক সংস্কার; এর ব্যতিক্রম যা দেখা যায় তা তার পক্ষে অস্বাভাবিক—কোনো বাইরের সংঘাতজাত।

যেদিন থেকে বাঙালী দেশকে মাতৃরূপে দেখেছে সেদিন থেকেই তার মুখে শোনা গেছে 'বন্দে মাতরম্'। এই 'বন্দে মাতরম্' তন্ত্রেরই মন্ত্র; এতে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে তা তন্ত্রেরই উন্মাদনা। শক্তিসাধক বাঙালীর কাছে এ মন্ত্রসাধনা অতি স্বাভাবিকভাবেই এসেছে।

মাতৃপূজায় চাই বলি, মহাবলি। তা বাঙালী ভোলে নি; তাই আত্মবলিতে তার দ্বিধা নেই। রক্তদানে সে কখনো পেছপা হয় না। এ সত্য বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

যে বাঙালী সমাজটা এখন 'বাংলা দেশ' বা পূর্ববঙ্গ জুড়ে রয়েছে, তাদের পক্ষেও সেই একই কথা খাটে। জন্মসূত্রে সে সমাজটিও তন্ত্রবাদের সহজাত সংস্কারে আবদ্ধ। দেশ তাই অতি সহজেই সে সমাজের মানুষের কাছে মাতৃরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাই, মায়ের গৌরব রক্ষার জন্য সমাজনেতা কম্বুকণ্ঠে রক্তদান বা আত্মবলির জন্য 'আজান' অর্থাৎ আহ্বান দিয়েছেন। আর হয়ত এই সহজ সংস্কারের ফলেই সে আহ্বান সার্থকও হয়েছে।

এবার আমরা বাঙালীর এই সংক্ষিপ্ত তান্ত্রিকতার কথা ছেড়ে তার তান্ত্রিক ব্যাখ্যানের কিছু পরিচয় দেব। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথাও শেষ হবে।

বাঙলায় তন্ত্রশাস্ত্র যে ঠিক কোন কাল থেকে তার স্থায়ী আসন পেতেছে তা বলা দুষ্কর। এটা খুবই সম্ভব যে প্রথম যুগের তন্ত্রশাস্ত্রের পুঁথির কিছু কিছু খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকেই লেখা হয়েছিল, কিন্তু এ সম্পর্কে প্রামাণিক কোনো তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি। শুধু 'সর্বজ্ঞানোত্তর তন্ত্র' ও 'কুব্জিকাতন্ত্র' যে বর্ণলিপিতে লেখা তা গুপ্তযুগের; হয়ত চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের। বাঙলা বলতে তখন 'বঙ্গ'কে বোঝাত বটে, তবে বাঙালী জাতির পত্তন তখনো হয়নি। হয়েছে হয়ত ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকে। তাই একথা অনুমান করলে অন্যায় হবেনা যে বাঙালী জাতি তার জন্ম থেকেই প্রধানতঃ তান্ত্রিকধর্মাবলম্বী। অবশ্য এখানে আমরা বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রকে এক করেই দেখেছি।

কিন্তু আদিপর্বের কালগত সমস্যাটার সমাধান না হলেও তন্ত্রের শেষপর্বের ইতিহাস স্পষ্ট। দ্বাদশ শতকে সেন রাজাদের আমলে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল বলে মনে হয়; সেকালের মান্যগণ্য জনের অন্যতম হলায়ুধ তান্ত্রিক পূজা ও আচার-বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন বলে কথিত। স্বয়ং রাজা বল্লালসেন আর তাঁর ছেলে লক্ষ্মণসেন দুজনেরই তন্ত্রবাদে আসক্তি ছিল বলে মনে করারও কারণ রয়েছে। তারপর চতুর্দশ শতকের লেখা 'কালিকা পুরাণ' দেবী কালিকার সাথে সাথে বাঙলায় তন্ত্রের আসন আরো পাকা করে দিয়েছে। পুরাণ যে বাঙালীরই লেখা, এ সম্পর্কে মতদ্বৈধ হবার কথা নয়।

তারপর যে সকল বাঙালী বিদগ্ধ তান্ত্রিক গুরু তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ লিখেছেন তাঁদের মধ্যে চতুর্দশ শতকের শেষপাদের পরিব্রাজকাচার্য অন্যতম। এঁর 'কাম্যযজ্ঞোদ্ধার' বিখ্যাত পুঁথি।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের প্রখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের 'তন্ত্রসার' বাঙলার সর্বজন মান্য ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তন্ত্র-সংহিতা। এতে সকল উল্লেখযোগ্য তন্ত্রেরই সারমর্ম রয়েছে; এ পুঁথিকে একখণ্ড বিরাট তন্ত্রাভিধান বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তন্ত্রশাস্ত্রে আগমবাগীশের জ্ঞান অসাধারণ ব্যাপক। 'তন্ত্রসার' গ্রন্থখানির সঙ্গে রচয়িতা আগমবাগীশ বাঙলায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বাঙলায় তন্ত্রের পুঁথি রচনা করে আর যাঁরা প্রখ্যাত হয়ে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র আর তিনজনের কথা আমরা উল্লেখ করব।

এক, ষোড়শ শতকের পূর্ববঙ্গ ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজক। দুই, ষোড়শ শতকের শঙ্কর আগমাচার্য। ইনি সম্ভবত উত্তরবঙ্গের মানুষ। তিন, সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের তান্ত্রিক গুরু রঘুনাথ তর্কবাগীশ। এঁর আবাস ছিল বাঙলার দ্বিতীয় নবদ্বীপে অর্থাৎ বর্তমান আন্দুলের নিকটবর্তী স্থানে।

এ পর্যন্ত আমরা বাংলায় প্রথম প্রকাশিত, প্রখ্যাত 'মহানির্বাণ-তন্ত্রে'র কথা কিছু বলি নি। রাজা রামমোহন রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে। এই জন্মগত সূত্রেই এটির ঘাড়ে পড়েছে কিছু কলঙ্ক বা অপকলঙ্ক।

কারো কারো মতে এ পুঁথিটিকে আদি ও অকৃত্রিম বলা চলে না; এটিতে বেশ কিছু ভেজাল রয়েছে। মনে হয়, এর মধ্যে রয়েছে রাজা রামমোহনের হস্তক্ষেপ। রামমোহনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উপনিষদের বাণী প্রচার করা। কিন্তু তাঁর কালে বাঙলায় উপনিষদ্‌গুলি ছিল একান্ত অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত; তখন ছিল তান্ত্রিক ধর্মের বিপুল প্রভাব। সমাজের সর্বস্তরে, এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও, তন্ত্রের

বাণী ছিল অমোঘ ও পরম অভীপ্সিত। তাই রাজা রামমোহন সুকৌশলে উপনিষদকে মানুষের মনে সসম্মানে স্থায়ী আসন দেবার জন্য তা তন্ত্রের মাধ্যমে উপহার দিয়েছেন সমাজকে। সেই মাধ্যমটি হল আদি ব্রাহ্মসমাজের এই মহানির্বাণতন্ত্র। এটিকে নিপুণভাবে সাজাতে গুছাতে সাহায্য করেছেন রামমোহনের তান্ত্রিক গুরু হরিহরানন্দনাথ।

এটি সত্যই কলঙ্ক না মিথ্যা কলঙ্ক, তার বিচার করবেন বিদ্বজ্জন।

আমরা বাঙালীর এই সংক্ষিপ্ত তন্ত্র ব্যাখানে দুটিমাত্র পুঁথির কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করব; সে দুটির একটী মহানির্বাণতন্ত্র, অন্যটি তন্ত্রসার। এ দুটি পুঁথিই বাঙালী তান্ত্রিকদের প্রকৃত ও সার্থক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তন্ত্রসার তান্ত্রিক আচার-পদ্ধতির সর্বশ্রেষ্ঠ দীপিকা। তন্ত্রসাগর মন্থন করে আগমবাগীশ এই অমূল্য রত্ন আহরণ করেছেন। তন্ত্রের নাম শুনেছে. অথচ তন্ত্রসারের নাম শোনেনি, এমন বাঙালী দুর্লভ।

এর পরিচ্ছেদ চারটি। প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে মঙ্গলাচরণ দিয়ে। তাতে পুঁথির লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে; লক্ষ্য তন্ত্রপদ্ধতির বোধসৌকর্য অর্থাৎ তন্ত্রের নিয়ম-কানুনগুলি সহজবোধ্য করা। সে লক্ষ্যভেদ তাঁর হয়েছে সন্দেহ নেই।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রথম পরিচ্ছেদটিকে মোটামুটি পাঁচটি অংশে ভাগ করা চলে। এক, গুরুর কথা; দুই, দীক্ষা ও পুরশ্চরণের রীতি; তিন, নানাবিধ চক্র অঙ্কন; চার, নির্ণয় বিচার সমস্যা ও পাঁচ, বিবিধ।

উপনিষদের ক্ষেত্রেও যেমনি, তন্ত্রেও তেমনি, গুরুর রয়েছে শিষ্য মনোনয়নের ক্ষমতা, আবার শিষ্যেরও রয়েছে গুরু মনোনয়নের শক্তি। কোন্ কোন্ শিষ্য বা গুরু গ্রহণযোগ্য নয় তার ইংগিত দেওয়া হয়েছে এ পরিচ্ছেদে। সাধারণত তন্ত্রের মতে. উদাসীনের উদাসীনকে, বনবাসীর বনবাসীকে, যতির যতিকে, গৃহীর গৃহীকে,

বৈষ্ণবের বৈষ্ণবকে এবং শৈবের শৈবকে গুরু করা কর্তব্য। শক্তি দীক্ষায় শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব তিনজনই দীক্ষাকর্তা হবার যোগ্য। কুলার্ণবতন্ত্রের মতে সর্বশাস্ত্রবিদ্ গৃহস্থই গুরুপদের যোগ্য। তন্ত্রে তন্ত্রে এ সম্পর্কে রয়েছে মতভেদ।

গৃহীর পক্ষে কোন্ কোন্ জিনিস দিয়ে জপমালা তৈরি করা প্রশস্ত ? সে জিনিসগুলি হল, রুদ্রাক্ষ, শঙ্খ, পদ্মবীজ, মুক্তা, স্ফটিক, রৌপ্য ও কুশমূল ; রুদ্রাক্ষের মালাজপে অনন্ত ফল লাভ হয়।

ভিন্ন ভিন্ন কামনায় মালার পরিবর্তন করতে হয়। শত্রুনাশের জন্য পদ্মবীজের মালা, পাপনাশের জন্য কুশমূলের মালা, অভীষ্টলাভে রৌপ্যমালা, ধনলাভে প্রবালমালা প্রশস্ত। ত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্রজপে রক্তচন্দন বীজমালা আর মহাবিদ্যা তারার মন্ত্রজপে মহাশঙ্খ মালার ব্যবহার বিধেয়। মহাশঙ্খ মালা কি ? মানুষের কান ও চোখের মাঝে যে হাড় রয়েছে তা দিয়ে তৈরী মালা।

দীক্ষা ব্যাপারে আমরা এখানে শুধু 'পঞ্চায়তনী' দীক্ষারই উল্লেখ করব। কারণ, এই একটি আচারের কথা থেকেই বোঝা যাবে, কি করে তন্ত্র পঞ্চোপাসক সর্বশ্রেণী হিন্দুর গৃহে তার স্থায়ী আসন পেতেছে।

'পঞ্চায়তনী' দীক্ষাতে শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য ও গণেশ এই পাঁচটি দেবতার যন্ত্র এঁকে তাঁদের বিধিমত পূজা করতে হয়। যিনি এঁদের মধ্যে যে দেবতাকে প্রধান বলে মানেন, তাঁর যন্ত্র আঁকতে হবে মধ্যভাগে। অন্য চারজনের যন্ত্রের স্থান তন্ত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

মঙ্গলকার্যে জলভরা কলসীর মুখে 'পঞ্চপল্লব' দিতে হয়। এ পাঁচটি পল্লব বা নূতন পাতা কোন্ কোন্ গাছের ? কাঁঠাল, আম, অশ্বত্থ, বট ও বকুলের।

শুভকার্যে ঘরদোরে নানারূপ মণ্ডল আঁকা হিন্দুদের বহু পুরাতন প্রথা। প্রথম পরিচ্ছেদে এর সচিত্র উল্লেখ রয়েছে—সর্বতোভদ্র,

স্বল্পসর্বতোভদ্র, নবনাভ, পঞ্চাব্জ প্রভৃতি। এর মধ্যে সর্বতোভদ্র প্রায় সর্বজনপরিচিত। দেখতে সবগুলিই অপরূপ ; এই বিচিত্র মণ্ডলগুলি দিয়ে দেয়াল বা ছাদ অঙ্কিত করলে হিন্দুগৃহ যে একটা বৈশিষ্ট্যলাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই। এই রেখাঙ্কনের মধ্যে পাঁচটি বর্ণের বিন্যাস করতে হয় ; হলদে, সাদা, লাল, কালো ও শ্যামল। যে সব জিনিসের চূর্ণ দিয়ে এ সব রং তৈরী হয় তা হল যথাক্রমে হলুদ, চাল, কুসুম্ভ-ফুলের পাপড়ি, ধানের খোসার ভস্ম ও বেলপাতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে নানা তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর পূজার বিধান ও মন্ত্র। এঁদের মধ্যে দেবী দুর্গা, অন্নপূর্ণা কালিকা তো রয়েছেনই, আরো রয়েছেন দশমহাবিদ্যা ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত দেবদেবী ; যেমন, বাগীশ্বরী, দধিবামন, হয়গ্রীব, শ্রীবিদ্যা প্রভৃতি। পূর্বেও বলেছি, তন্ত্রের বিশাল রাজত্বে পঞ্চোপাসকদের সবাই ঠাঁই পেয়েছে কাজেই এতে রয়েছে বিষ্ণুমন্ত্র সূর্যমন্ত্র, শ্রীরামমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র এমন কি বালগোপাল, বাসুদেব ও লক্ষ্মী-নারায়ণমন্ত্র।

তন্ত্রমতে এঁদের ধ্যানমূর্তিগুলির কথা সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে।

সূর্যদেবের হাতে দুটি রক্তপদ্ম আর অভয় ও বরমুদ্রা। এঁর দেহে নানা অলঙ্কার ; কেয়ূর বা বাজু, হার, বলয়, কুণ্ডল, মাথায় মাণিক। এঁর তিনটি চোখ ; দেহকান্তি বন্ধুক ফুলের মত রক্তবর্ণ। ইনি রক্ত-পদ্মের আসনে বসে রয়েছেন।

মতান্তরে, এঁর কান্তি সুবর্ণ-পদ্ম ও প্রবালের মত। হাতে এঁর খট্টাঙ্গ, ধনু, চক্র, শক্তি, পাশ, অঙ্কুশ, অক্ষমালা ও কপাল বা মাথার খুলি। এঁর চারটি মুখ, তিনটি চোখ আর অর্ধাঙ্গ জুড়ে রয়েছে এঁর নিজের অর্ধাঙ্গিনী।

বিষ্ণুর তেজ নবোদিত শত সূর্যের মত। উত্তপ্ত সোনার মত দেহকান্তি। এঁর একদিকে লক্ষ্মী, অন্যদিকে বসুমতী। এঁর দেহে নানা অলঙ্কার। হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ; পরনে পীতবস্ত্র।

শ্রীরামের দেহকান্তি মেঘের মত কৃষ্ণবর্ণ। এঁর দেহ কোমল,

ইনি বীরাসনে বসে রয়েছেন ; এঁর এক হাতে জ্ঞানমুদ্রা, অন্য হাত রেখেছেন জানুর ওপরে। পাশে পদ্মফুল হাতে নিয়ে বসেছেন সীতা ; তাঁর বর্ণ বিদ্যুতের মত চোখ-ঝলসানো। শ্রীরাম সীতার দিকে চেয়ে রয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ রমণীয় বৃন্দাবনে শতসহস্র গোপবালাকে মোহিত করছেন। গোপবালারা মদনাতুরা—শ্রীকৃষ্ণকে নানা দেহগত ছলাকলা দিয়ে প্রলুব্ধ করছে। শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি অপূর্ব সুন্দর, শিরে ময়ূরপুচ্ছ, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি, পরনে পীতবাস। ইনি বাঁশি বাজাচ্ছেন—এঁর সকল দেহে নানা অলঙ্কার।

দধিবামন গৌরকান্তি ; মুক্তার মত তাঁর জ্যোতি। ইনি চন্দ্রমণ্ডলের অধিবাসী। এঁর দেহে নানা অলঙ্কার ; কেশ ভ্রমরের ন্যায় কালো। সাদা মুখে কালো চুলের শোভা অপূর্ব। এঁর এক হাতে জলভরা সোনার কলস, অন্য হাতে সোনার বাসনে অন্ন ও দধি।

হয়গ্রীবের মুখ ঘোড়ার মুখের মত, দেহকান্তি শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের মত স্নিগ্ধ। এঁর দেহে নানা অলঙ্কার। এঁর হাত চারটি ; শঙ্খ ও চক্র রয়েছে দুটি হাতে অন্য দুটি হাত রয়েছে তাঁর জানুর ওপর।

এবার বলা যাচ্ছে বাগীশ্বরী বা বাগ্‌দেবতার কথা। বাগীশ্বরীর ধ্যানমূর্তি কি ?

> "তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
> কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
> নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
> সকল বিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।

দেবীর কপালে তরুণ শশিকলা ; এঁর বর্ণ শুভ্র, কুচভারে দেহ নত। এঁর আসন একটি শ্বেতপদ্ম ; একহাতে লেখনি. অন্যহাতে পুঁথি।

অধুনা প্রচলিত বাঙলায় বাগ্‌দেবী সরস্বতীর সঙ্গে এঁর ধ্যান-মূর্তির প্রভেদ সামান্যই।

এ পরিচ্ছেদে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কিছু যন্ত্রের কথা ; শ্যামাযন্ত্র, গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী ও মহাকালী যন্ত্র, তারাযন্ত্র ইত্যাদি।

মুণ্ডমালাতন্ত্রমতে শ্যামাযন্ত্র আঁকতে হবে তামা, লোহা, রূপা বা সোনার পাত্রে, শনি অথবা মঙ্গলবারে মৃত মানুষের শরীরে অথবা মানুষের মাথার খুলিতে।

এ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে 'রহস্য পুরশ্চরণ'এর কথা। ব্যাপারটার মধ্যে একটু পৈশাচিকতার ভাব রয়েছে। এই পুরশ্চরণে উপাচার হিসাবে প্রয়োজন একটি মানুষের মাথা। এ পুরশ্চরণ সাধন করতে হয় শনি অথবা মঙ্গলবারে। সে মাথাটি শোধন করতে হবে পঞ্চগব্য ও চন্দন দিয়ে, তারপর তা পুঁততে হবে বনে, আধহাত মাটির নিচে। সে মাটির ওপর বসে রাত্রে একাকী ইষ্টমন্ত্র জপ করলেই পুরশ্চরণ হবে। এ পুরশ্চরণে সিদ্ধ হলে সাধক হবেন কল্পতরুসিদ্ধ অর্থাৎ যে কেউ যা কিছু তাঁর কাছে চাইবে, তা-ই তিনি দিতে পারবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে 'কর্ণপিশাচী' মন্ত্র দিয়ে আর শেষ হয়েছে 'যোগিনীসাধনে'র স্থান, কাল ইত্যাদির কথায়। মাঝে রয়েছে তন্ত্রোক্ত নানা সাধারণ বা অবিশিষ্ট দেবতার মন্ত্র, অভিচার কার্যের পদ্ধতি, যোগিনীসাধনের রীতি ইত্যাদি। যোগিনী বহুবিধ ; সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী প্রভৃতি।

যোগিনীসাধন করতে হবে কখন ? বসন্তকালে ; সাধক হবেন হবিষ্যাশী, ধীমান্ ও জিতেন্দ্রিয়। ধ্যান করতে হবে উজ্জটে বা প্রান্তরে ; বিশেষ ফল পাওয়া যাবে কামরূপে। ব্রহ্মোপাসক সন্ন্যাসীর এ সাধনায় অধিকার নেই।

যোগিনীদের তিনভাবে সাধনা করা চলে ; মাতৃভাবে, ভগ্নীভাবে ও ভার্যাভাবে। মাতৃভাবে ভজনা করলে দেবী সাধককে পুত্রবৎ

পালন করেন, ভগ্নীরূপের সাধনায় সাধক প্রত্যহ রাজকন্যা ও নাগকন্যা লাভ করেন আর হন ভূতভবিষ্যদ্‌বেত্তা। ভার্যাভাবে বন্দনায়ও লাভ কম হয় না ; বিপুল ধন, নানা প্রকার সুখাদ্য ও শত সুবর্ণ মুদ্রা রোজই সাধকের ভাগ্যে ঘটে।

কর্ণপিশাচীর ধ্যানমূর্তি কি ? ইনি কৃষ্ণকায়া, রক্তনয়না, খর্বকায়া ও লম্বোদরী। এঁর তিনটি চোখ, জিহ্বা রক্তবর্ণ। ইনি সর্বজ্ঞা—শবদেহের হৃৎপিণ্ডে এঁর অবস্থান। এঁর পূজায় ভোগ দেওয়া হয় দগ্ধ মৎস্য আর বলি তো দিতেই হয়।

এবার মঞ্জুঘোষের কথা বলে এ পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণ শেষ করা যাক।

মঞ্জুঘোষ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। হাতে খড়্গ ও পুঁথি। ইনি শান্তমূর্তি ; এঁর দেহকান্তি অপরূপ। ইনি পদ্মপলাশলোচন ; সাধকের কুমতি দূর করেন। এঁর মধ্যে তমোগুণের প্রাবল্য ; ইনি পীতবাস পরেন।

মঞ্জুঘোষের উপাসনায় দেবার্চন ও স্নান করা চলে না, আর চলে না ওঁ বা প্রণব উচ্চারণ। এ দেবতার উপাসনার কালে সর্বদা ও সর্বথা অপবিত্র থাকতে হবে !

চতুর্থ অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদটিকে মোটামুটি ছয় ভাগে সাজানো চলে ; কুণ্ড, স্তোত্র, কবচ, যন্ত্র, প্রয়োগ ও বিবিধ।

হোমের জন্য যে গর্ত খোঁড়া হয় তার নাম কুণ্ড। কুণ্ডটিকে নানাবিধ সুঠাম রেখাচিত্রের মত করে তৈরী করা হয় ; যেমন, অর্ধচন্দ্রকুণ্ড, পদ্মকুণ্ড, ত্র্যস্রকুণ্ড, ষড়স্রকুণ্ড প্রভৃতি। কোন্ কুণ্ডটি কোন্ কোন্ কাজের জন্য তন্ত্রমতে প্রশস্ত, তা এ পরিচ্ছেদে সচিত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

স্তোত্র দেবতার প্রশস্তি। বহু দেবতার স্তোত্র রয়েছে এ পরিচ্ছেদটিতে। কবচ বা তাবিজ আমাদের বিশেষ পরিচিত মন্ত্রৌষধ। তান্ত্রিক সাধকেরা ও গ্রহবিপ্রেরা বা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা

কাগজে বা তালপাতায় মন্ত্র লিখে তামার মাদুলিতে পুরে তা দেহের সাথে সুতা দিয়ে বেঁধে দেন। রোগ ও গ্রহদোষের প্রতিকার হিসাবেই এগুলির প্রচলন এখনও অব্যাহতই রয়েছে। কোন্ রোগে ও গ্রহদোষে কোন্ দেবতার কবচ কার্যকর হবে তা বিচার করেন কবচদাতারা।

যন্ত্রের অর্থ পূর্বেই বলা হয়েছে; এ পরিচ্ছেদে রয়েছে বহু সামান্য ও অসামান্য দেবতার যন্ত্রের পরিচয়।

প্রয়োগ অর্থে বোঝা যায় অযুত মন্ত্র জপ ও অযুত হোম। বলা বাহুল্য, একই মন্ত্রে সকল দেবতার পূজা হয় না, হোমও হয় না। প্রত্যেকটি দেবতার জন্যই বিভিন্ন মন্ত্র রয়েছে; সে সব মন্ত্রের উল্লেখ করেই বিভিন্ন দেবতার প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। প্রয়োগ সাধনের ফল কি? নানাবিধ ফললাভের জন্যই সাধক এ সাধনা করেন; যথা, বশীকরণ, শত্রুক্ষয়, পুষ্টি, শান্তি, ঐশ্বর্যবৃদ্ধি, এমন কি কবিত্বশক্তি লাভ। আরো কত কি!

যে ভাগকে আমরা বিবিধ বলছি তার মধ্যে অনেক বিষয় ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। আমরা তার কিছু কিছু মাত্র উল্লেখ করছি।

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি ছাড়া সমস্ত পূজাই নিষ্ফল হয়। এই পঞ্চাঙ্গের অঙ্গগুলি কি কি? আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা। এদের শুদ্ধি-প্রক্রিয়ার বর্ণনা থেকে মাত্র দুটির কথা বলছি। আত্মা শুদ্ধ হয় তীর্থের বা অন্যত্র বিশুদ্ধ জলে স্নান করে ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ষডঙ্গন্যাস করলে। দেবতা শুদ্ধ হন পীঠশক্তির পূজা ও যথাযোগ্য মুদ্রাদি করে মূলমন্ত্রে মালা, ধূপ ও দীপ দান করলে।

কৃষ্ণ ষট্‌কর্মানুষ্ঠানের প্রশস্ত কাল কি? শান্তিকর্মে হেমন্ত, বশীকরণে বসন্ত, স্তম্ভনে শিশির, বিদ্বেষণে গ্রীষ্ম, উচ্চাটনে বর্ষা আর মারণকার্যে শরৎ।

এমনি রয়েছে তিথি, বার, আসন ও মুদ্রার বিভিন্নতা—লক্ষ্যের

বিভিন্নতায়। কোন্ কোন্ আসন ষট্‌কর্মে প্রশস্ত? পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বিকটাসন, কুক্কুটাসন, বজ্রাসন ও ভদ্রাসন।

ছাগাদি বলির ফল কি? মুণ্ডমালা তন্ত্রমতে ছাগবলিদানে সাধক হন বাগ্মী, মেষ বলিদানে কবি, পক্ষী ও মহিষ বলিদানে ধনসমৃদ্ধ, মৃগ বলিদানে মোক্ষফলভাগী, আর নরবলিদানে অষ্টসিদ্ধ!

জলচর, ভূচর ও খেচর এই ত্রিবিধ প্রাণীর মাংসই দেবতার প্রিয়। মৎস্য তিন শ্রেণীর; উত্তম হল শাল, রুই ও পাঠীন বা বোয়াল। মধ্যম হল তৈলাক্ত ও ছালযুক্ত আর অধম হল কণ্টকযুক্ত ও ছোট। ভূচর মাংসকে বলা হয় মহামাংস; এগুলি অষ্টবিধ। এর মধ্যে রয়েছে মেষমাংস, অশ্বমাংস, মহিষমাংস, গোধামাংস, ছাগমাংস, উষ্ট্রমাংস, মৃগমাংস ও গোমাংস!

এ পরিচ্ছেদে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যোগের কথা, তারপর ষট্‌চক্র ভেদ, অনাহতপদ্ম, সহস্রদল পদ্ম ইত্যাদির বর্ণনা।

এবার কুলাচার নিরূপণের কথা বলে তন্ত্রসার সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য শেষ করব। আমাদের মত সাধারণজনের চিরকালের ধারণা যে, তন্ত্রসাধনার সঙ্গে নারীর অবমাননা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই আমরা এই অংশ থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এ থেকে বুঝতে পারা যাবে তন্ত্রশাস্ত্রের সত্যিকার অভিমত।

মোক্ষলাভের জন্য সর্বভূতের হিতানুষ্ঠানে রত থাকবে, সাময়িক আচার প্রতিপালন করবে, অনিত্যফলজনক কর্ম ত্যাগ করে নিত্যকর্মে তৎপর হবে, সভক্তি সদা মন্ত্র চিন্তা করে ইষ্টদেবতাকে সবকর্ম নিবেদন করবে।

নারীর প্রতি রোষ, নারীকে প্রহার কদাচ করবে না। সারা জগৎ নারীময়, একথা চিন্তা করবে; নিজেকেও নারীময় বলে জ্ঞান করবে। বালিকা, তরুণী, বৃদ্ধা, সুন্দরী, কুৎসিতা অথবা মহাদুষ্টা নারীকেও প্রণাম করে ইষ্টদেবতাস্বরূপ চিন্তা করবে। নারীকে

প্রহার করা, নিন্দা করা, তার প্রতি কুটিলতা প্রকাশ করা, তার অপ্রিয় কার্য করা সর্বথা পরিত্যাজ্য।

নারীকে দেবতাস্বরূপ, জীবনস্বরূপ ও বিভূষণস্বরূপ জ্ঞান করবে।

"স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব বিভূষণম্।"

এবার আমরা মহানির্বাণতন্ত্রের কথা বলে আমাদের আখ্যান শেষ করব। মিশ্র বা অবিমিশ্র যা-ই হোক না কেন, এ তন্ত্রখানি বহুখ্যাত। এর কাঠামোটা পুরনো না মনে করার বিশেষ কোনো কারণ নেই; হয়ত এর মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ঢোকানো হয়েছে। মনে হয়, দ্বিতীয় (?) ষষ্ঠোল্লাসের 'ব্রহ্মের স্বরূপ' এরূপই একটি শ্লোক। এখানে উপনিষদের ব্রহ্ম এসে তন্ত্রের রাজত্বে রাজটিকা পরেছেন। সে শ্লোক যথাস্থানে উল্লেখ করা যাবে।

মহানির্বাণতন্ত্রের চৌদ্দটি উল্লাস বা পরিচ্ছেদ। এটি হিন্দুতন্ত্র অর্থাৎ হিন্দুতন্ত্রের যে সব লক্ষণ তা এতে পুরোপুরি রয়েছে। এই লক্ষণের বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

প্রথম উল্লাসে রয়েছে কৈলাসবর্ণন, শিববর্ণন ও যুগবর্ণন প্রভৃতি। এতে মদ্যপানের দোষ সম্পর্কেও আলোচনা জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় উল্লাসে তন্ত্র সাধনাকে কলিযুগে একমাত্র পন্থা বলে বলা হয়েছে। এ যুগে বেদমন্ত্র নিষ্ফল। বলা বাহুল্য, তন্ত্রবাদীরা বেদকে অর্থাৎ শ্রেয়ঃপন্থাকে শুধু এ যুগের পক্ষেই উপযোগী বলে মনে করে না, যদিও এ পথের যে কোনোদিনই উপযোগিতা ছিলনা, তা বলে না। কাজেই তন্ত্রবাদীদের বেদবিরোধী বলা চলে না।

এ উল্লাসে ব্রহ্মের স্বরূপ ও আরাধনার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় উল্লাসে রয়েছে দেবীর ব্রহ্মসাধন সম্পর্কে প্রশ্ন। চতুর্থে পরমাপ্রকৃতি সাধনার কথা ও কৌল প্রশংসা।

পঞ্চমে আদ্যাকালীর মন্ত্রসাধন ও গায়ত্রী বা সাবিত্রী নিয়ে

আলোচনা। এর মধ্যে মদ্য, মাংস প্রভৃতি শোধনের কথাও রয়েছে।

ষষ্ঠে রয়েছে সুরাভেদ, মৎস্যভেদ, তর্পণ, তর্পণমন্ত্র ইত্যাদির আলোচনা। কোন্ কোন্ সুরা দেবীর প্রিয়; কোন্ জাতীয় মৎস্যই বা তাঁর ভোগে লাগে? মদ্য ও মৎস্যগুলি যে বাঙলার তাতে সন্দেহ নেই; তার বিশদ উল্লেখ পরে করা যাবে।

সপ্তমে স্তব ও কবচ সম্পর্কে দেবীর প্রশ্ন আর আদ্যাকালীর শতনাম।

অষ্টমে বর্ণাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, ভিক্ষুকাশ্রম, স্ত্রী, কন্যা পুত্রের প্রতি ব্যবহার, বৈরাগ্যের কাল প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা।

নবমে রয়েছে দশবিধ সংস্কার, কুশণ্ডিকা, হোম, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি হিন্দুর সামাজিক বিষয়ের বিচার।

দশমে শ্রাদ্ধ সম্পর্কে দেবীর প্রশ্ন ও কৌল অর্চনার প্রসঙ্গ।

একাদশে স্থান পেয়েছে দণ্ডবিধান ও প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ।

দ্বাদশে রয়েছে দায়ভাগ বা উত্তরাধিকারীর কথা, অশৌচ ও ব্যবহার বিধি।

ত্রয়োদশে দেখা যাবে প্রকৃতির রূপনির্ণয়ের আলোচনা ও মহা-কালীর প্রতিষ্ঠার কথা।

চতুর্দশের উপজীব্য শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও লিঙ্গ মাহাত্ম্য।

বলা বাহুল্য, মহানির্বাণতন্ত্র একখানি শৈবাগম অর্থাৎ এখানে সদাশিব বক্তা, দেবী শ্রোতা।

এই তো গেল মহানির্বাণতন্ত্রের বিষয়বস্তুর কথা। এবার এ সব তত্ত্বের আলোচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে পুঁথিটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো একটু ঘনিষ্ঠ করে নেওয়া যাক।

উত্তম সুরা কি কি?

> "গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।
> সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জ্জুরসম্ভবা।"

গুড়, পিঠা ও মধু থেকে যে তিন রকমের মদ তৈরী হয় তা-ই সর্বাপেক্ষা ভাল মদ। তাল ও খেজুর রসের মদ উত্তম সুরা শ্রেণীতে পড়ে না।

মাংস সম্পর্কে তান্ত্রিকদের ছিল বেপরোয়া ভাব। তন্ত্রসারে এর যে তালিকা রয়েছে তাতে মনে না করার কারণ নেই যে দেবী সর্বভুক্; ভোজ্য হিসাবে সাধক দেবীকে সর্বপ্রকার মাংসই নিবেদন করতে পারেন। মনে হয়, মহানির্বাণে এ বেপরোয়া ভাবটা একটু সংযত হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে সাধকের কেবল নিজের তৃপ্তিকর মাংসই দেবীকে নিবেদন করতে হয়। তারপর এ তন্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে মাংসাশী জীবের মাংস আর নরাকৃতি পশুর মাংস।

এবার মাছের কথা।

"উত্তমা স্ত্রিবিধা মৎস্যাঃ শাল, পাঠীন রোহিতাঃ।
মধ্যমাঃ কন্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ॥
তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যা যদি সুষ্ঠু বিভর্জ্জিতাঃ॥"

উত্তম মৎস্য হল শাল, বোয়াল ও রুই। মধ্যম হল কাঁটাহীন মাছ আর অধম হল সে সব মাছ যাদের কাঁটার অন্ত নেই। কড়কড়ে ভাজা হলে অধম মাছও দেবীর ভোগে চলে।

শুদ্ধ না করে মদ্য পান করলে কি হয়?
"শুদ্ধিং বিনা মদ্যপানং কেবলম্ বিষভক্ষণম্।
চিররোগী ভবেন্মন্ত্রী স্বল্পায়ুর্ম্রিয়তেঽচিরাৎ॥"

বিনা শুদ্ধিতে মদ্যপান কেবল বিষপানের তুল্য। এতে মানুষ হয়ে পড়ে চিররোগী ও স্বল্পায়ু।

দশবিধ বলি দেবীপূজায় প্রশস্ত। সেগুলি কি কি?

মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী অর্থাৎ সজারু, শশক, গোধা বা গোসাপ, কূর্ম বা কাছিম ও গণ্ডার।

গৃহস্থের কর্তব্য ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে রাজার কর্তব্য সম্পর্কে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥"

কন্যাকেও এমনভাবে পালন করে ও শিক্ষা দিয়ে বিদ্বান বরকে দান করবে—সঙ্গে দেবে ধনরত্ন অর্থাৎ যৌতুকসহ।

"শুল্কেন কন্যাং দাতৄংশ্চ পুত্রং ষণ্ডে প্রযচ্ছতঃ
দেশান্নির্যাপেয়েদ্রাজা পতিতান্ দুষ্কৃতাত্মনঃ।"

যে পুত্র বা কন্যা দান করে পণ নিয়ে বা যে অপদার্থ অযোগ্য বরকে কন্যাদান করে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা রাজার কর্তব্য।

চতুরাশ্রম কলিযুগের পক্ষে উপযোগী নয়। এ কালের যোগ্য মাত্র দুটি আশ্রম: গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুকত্ব বা সন্ন্যাস। শৈব সংস্কারে অবধূত আশ্রম গ্রহণের নামই সন্ন্যাস।

সন্ন্যাসীর শবদেহ দাহ করা অবিধেয়।

কলিযুগে চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ চলবে না। বিভাগ হবে পাঁচটি: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সাধারণ।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কাকে বলা হয়? একজন মৃতের উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তার নাম একোদ্দিষ্ট। একে আদ্য বা প্রথম শ্রাদ্ধও বলে। প্রেতের অন্নে ও পিণ্ডে মাছ ও মাংস জুড়ে দেওয়া চলে। কাজেই শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ-ভোজনে, এই তন্ত্রমতে, মাছ ও মাংসের ব্যবহার আচারবহির্ভূত নয়।

পিণ্ডদানের শ্লোকটি ঔদার্যে অতুলনীয়।

"যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেঽপি ব্যালব্যাঘ্রহতাশ্চ যে
যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ
মদ্দত্ত পিণ্ডতোয়াভ্যাং তে যান্তু তৃপ্তিমক্ষয়াম্।"

আমার কুলে যাঁরা লুপ্তপিণ্ড হয়েছেন, যাঁদের স্ত্রীপুত্র কিছুই ছিল না, যাঁরা আগুনে পুড়ে মরেছেন বা সর্পাঘাতে ও বাঘ প্রভৃতি বন্য জন্তুর দ্বারা হত হয়েছেন, যাঁরা আমার এ জন্মে বা অন্যজন্মে বান্ধব ছিলেন, এমন কি অবান্ধবও, তাঁরা সবাই আমার দেওয়া এ পিণ্ড ও জলে তৃপ্তিলাভ করুন।

জীবনে গুরু পরিবর্তন কি অন্যায়, অবিধেয় ও অহিতকর?

সাধারণের ধারণা এটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, নিতান্তই অসঙ্গত। কিন্তু তন্ত্র বলে:

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধ স্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ মধুর লোভে যেমন ভ্রমর এক ফুল থেকে অন্য ফুলে চলে যায়, তেমনি জ্ঞানের লোভেও শিষ্য এক গুরু ছেড়ে অন্য গুরু গ্রহণ করতে পারে।

শিবলিঙ্গ বহুপ্রকার; স্বয়ম্ভু, দৈব, রৌদ্র, মানস, বাণ, বারুণ, বৈষ্ণব, বায়ু, রাক্ষস, আগ্নেয় ইত্যাদি। প্রত্যেকটির লক্ষণ বিভিন্ন। এ-সবের বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে চতুর্দশ উল্লাসে।

কৌল-সম্পর্কে মহানির্বাণতন্ত্র বলে:

"সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়॥"

যিনি ব্রহ্মকে সর্বজনের মধ্যে দেখেন, তাঁকে সর্বত্রই দেখেন, তিনিই প্রকৃত কৌল—তিনিই জীবন্মুক্ত।

ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্পর্কে মহানির্বাণতন্ত্র কি বলেছে?

"স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥
নির্ব্বিকারো, নিরাধারো, নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥

গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতঃ ॥"

তিনি এক, অদ্বিতীয়, সত্য, নিত্য, পরাৎপর ও স্বপ্রকাশ। তিনি দাপূর্ণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

তিনি নির্বিকার, আধারহীন, অভিন্ন ও প্রশান্ত। তিনি গুণাতীত, সর্বদ্রষ্টা।

তিনি সর্বব্যাপী, শাশ্বত, সর্বভূতের আশ্রয়। তিনি ইন্দ্রিয়হীন, তবু সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তিই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

যাঁরা উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ কথা পড়েছেন তাঁদের কাছে যে এরূপ ব্যাখ্যা তারই প্রতিধ্বনি বলে মনে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। তন্ত্রের উপজীব্য শক্তিপূজা, ব্রহ্মবাদ নয়। তাই শ্রেয় ও প্রেয়ের পথকে ভিন্ন করে দেখাই বোধহয় সমীচীন, যদিও দুয়ের লক্ষ্য এক-ই। কারো কারো মতে শাক্তরা মায়ায় ঢাকা ব্রহ্মেরই উপাসক; শক্তি ব্রহ্মেরই মায়া, তাই তান্ত্রিকের মুখে নিত্যবাণী 'তারা ব্রহ্মময়ী'।

আমাদের তন্ত্রের কথা শেষ হল। এর সঙ্গে সঙ্গেই মনে যে-প্রশ্নটি জাগে তা হল—মানুষের পক্ষে কোন্ পথটি সহজ; বৈদিক না তান্ত্রিক? প্রথমটি বজনের পথ, দ্বিতীয়টি অজনের। অবশ্য লক্ষ্য দুটিরই এক-ই। প্রেয়কে বাদ দিয়ে শ্রেয় গ্রহণ সাধারণজনের পক্ষে সম্ভবপর কি না, স্বাভাবিক কি না, তা বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। আবার অরক্ষিত প্রেয়ের পথ যে অচিরে ও সহজেই বিপথ হয়ে দাঁড়ায় তাতে তো সন্দেহ নেই।

শ্রেয়োবাদের ছত্রতলে বাঙালী ভারতীয়, আবার প্রেয়োবাদের সাধনাই তার বৈশিষ্ট্য। তবে বাঙালী এখন তন্ত্রের প্রকৃত সাধনা ভুলেছে; তান্ত্রিক জগতে আজ যা তার সম্বল তা তন্ত্রের খোলস মাত্র

সংক্ষিপ্ত প্রমাণ-পঞ্জী

১. অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদসংহিতা—দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

২. কালিকাপুরাণ

৩. কালীবিলাসতন্ত্র

৪. কুলার্ণবতন্ত্র

৫. গৌতমীয়াতন্ত্র

৬. বিশ্বসারতন্ত্র

৭. মহানির্বাণতন্ত্র

৮. যোগিনীতন্ত্র

৯. তন্ত্রসার—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

Woodroffe, Sir John—

১০. Introduction to Tantra Shastra

১১. Do Principles of Tantra

১২. Do The Serpent Power

Chakravarti, C. H.—

১৩. An Introduction to Buddhist Esoterism

১৪. Bhattacharjee B. Tantras : Studies on their Religion and Literature

বিষয়সূচী